বিমল কর

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭১

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও মুদ্রণ নিকেতন, ১৬ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রীসত্যকিঙ্কর পান কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার

কল্যাণীয়েষু

সঙ্গিনী

মহীপতি আলমারি খুলে কিছু কাগজপত্র বের করে নিচ্ছিল, বাইরে কুকুরটা ডেকে উঠল। প্রথমটায় সে কান করল না, দরকারী কাগজগুলো বেছে আলাদা করছিল; পরে সামান্য মনোযোগ দিয়ে ডাকটা শুনল। নিজের পোষা কুকুরের ডাক সে চেনে; মনে হল, বাইরে কেউ এসেছে, বাগান থেকে ফুল ছিঁড়তে বা গাছের পেয়ারা চুরি করতে; ভিখিরী-টিখিরীও হতে পারে।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করতে করতে ঘরের ভেতর থেকেই মহীপতি উঁচু গলায় কুকুরটাকে বারকয়েক ডাকল।

তারপর বাইরে এল মহীপতি। কুকুরটা তখনও ডাকছে। বারান্দায় এসে মহীপতি দেখল, তার বাড়ির ফটকের ওপারে এক মহিলা, এপারে তার পোষা কুকুর।

বাগানটুকু পেরিয়ে তাড়াতাড়ি মহীপতি ফটকের সামনে এসে গেল। কুকুরটাকে তর্জন করতে লাগল: এই বাচ্চু, চুপ···, চুপ কর,···শাট্ আপ্।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহীপতি আরও অবাক, চিনতে পেরেও চিনতে পারছিল না, বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিমূঢ়, হতচকিত অবস্থা। কয়েক মুহূর্ত যেন কী রকম আড়ষ্টতার মধ্যে কাটল। তারপর দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার মতন মহীপতির চোখের দৃষ্টিতে সবিস্ময় আনন্দ জ্বলে উঠল। "আরে—তুমি?"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মহীপতিকে ধীরে-সুস্থে স্পষ্ট করে, গভীর চোখে সে দেখছিল, ঠোঁটে সামান্য হাসি, চোখ উজ্জ্বল।

মহীপতি তার কুকুরের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দেবার জন্যে খানিকটা নুয়ে পড়েছিল: চুপ কর···যা, যা পালা বেটা, জল্‌দি ভাগো।

"খুব অবাক করে দিয়েছি, না?"

"হ্যাঁ ভীষণ অবাক," মহীপতি বলল, "এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"পারছ না? তা হলে আরও একটু সময় নাও, ছুঁয়ে-টুয়ে দেখো, এখন তো দিনের আলো।" সরল পরিহাস করে ও হাসল।

মহীপতি হাসল। "ভেতরে এস।"

"ভেবেছিলাম তাই যাব। ফটকও খুলেছিলাম। কিন্তু তোমার যা পাহারাদার, ভয় পেয়ে আবার এসে দাঁড়িয়েছি।"

মহীপতি সহাস্য মুখে ফটক খুলল। "এস।"

"না, এখন থাক।"

"আমি রয়েছি, ভয় কি! বাচ্চুও চুপ করে গেছে···। এস।"

"না, এখন থাক। ওরা দাঁড়িয়ে আছে।"

"কারা?" মহীপতি গলা বাড়াল।

অনেকটা তফাতে ছোটখাটো একটা দল, পাঁচ-সাতজন হবে হয়ত, মাঠে গাছতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, কে যেন হাত পা ছড়িয়ে বসেও পড়েছে।

মহীপতি বলল, "তোমার দল? কোথায় যাচ্ছ সব? সুবর্ণরেখা?"

"শুনেছি এদিক দিয়েই সোজা। আর কতটা হাঁটতে হবে?"

"বেশি নয়, সিকি মাইলটাক।" মহীপতি ফটক খুলে বাইরে এসে আবার বন্ধ করল। "চলো, খানিকটা এগিয়ে দি তা হলে।"

কয়েক পা হেঁটে মহীপতি বলল, "সত্যি, তুমি আজ সকালে আমায় চমকে দিয়েছ, পার্বতী।"

পার্বতী আড়চোখে মহীপতিকে দেখল। "ভেবেছিলাম কাল বিকেলেই চমকে দেব।"

"কা—ল? কালকেও এসেছিলে?"

"না; কাল বিকেলে তোমায় দেখলাম, লালরঙের একটা মোটরবাইক করে আসছিলে, আমরা তখন ওই স্টেশনের পিচের রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে, বেড়াতে বেরিয়েছি। ওরা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান কিনছিল, আর তুমি কাঠগোলার সামনে তোমার মোটর বাইক দাঁড় করিয়ে কথা বলছিলে। তারপর দেখলাম, এই রাস্তাটায় নেমে পড়লে।"

মহীপতি পার্বতীকে দেখছিল। বলল, "ডাকলে না কেন?"

"ভাল করে না চিনেই ডাকব?"

"সকালে ভাল করে চিনলে?"

"খানিকটা তাই।...আজ এই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে খুঁজছিলাম। বাড়িঘর তো দু-চারটে। তোমার বাড়ির সামনে এসে দেখলাম, ফটকের গায় নাম পদবী ঝুলছে তোমার, এম. চৌধুরী। মানুষটার সঙ্গে নাম পদবী মিলল, যদিও মানুষটা দেখলাম না। একটু সন্দেহ ছিল বই কি।"

মহীপতি অকারণে নীচু গলায় হাসল। "নাম ধরেই ডাকলে পারতে?"

পার্বতী কোন জবাব দিল না। তাব দল আর খানিকটা দূরে। এদিক পানেই তাকিয়ে আছে, অবাক হয়েছে নিশ্চয়।

হাঁটতে হাঁটতে পার্বতী এবার বলল, "ওরা খুব অবাক হয়ে গেছে। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা এগোও, আমি আস্তে আস্তে যাব, এক গ্লাস জল খেয়ে নেব বাড়ি থেকে চেয়ে। বিশ্বাস করেনি; ভেবেছিল, আমি অচেনা বাড়ি থেকে জল চেয়ে খেতে পারব না।"

"কই, জল তো খেলে না?"

"এই সাত সকালে কে জল খায়। এমনি বলেছিলাম, ওদের এগিয়ে দিতে। রবি বাজি ধরেছিল, পাঁচ টাকা, আমি নাকি পারব না। বললাম, তোমরা এগোও, দূরে দাঁড়িয়ে দেখ, ঠিক পারব..." পার্বতী হাসল।

মহীপতি দলটার দিকে লক্ষ্য করল: জনা ছয়। চারজন বড়, একটা বুঝি সালোয়ার কামিজ পরা, অন্যজন বাচ্চা। মহীপতি দলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "পুজোর ছুটিতে দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছ?"

পার্বতী ছোট করে ঘাড় নাড়ল। "পুজো শেষ করেই এলাম, দেওয়ালী পর্যন্ত থাকার ইচ্ছে।"

মহীপতি সামান্য অন্যমনস্ক হল। কাল রাতে মেঘলার মতন হয়েছিল, বৃষ্টি পড়েনি, হিম পড়েছে, হিমের ঠাণ্ডা এখনও মেঠো

ঘাসে জড়িয়ে আছে, লতাপাতা আর্দ্র, লালচে ধুলো আর ভিজে ঘাসের ছোঁয়ায় তার পাজামার পায়ের দিকটা রঙ ধরেছে। এইমাত্র এই রঙ ধরল, না, আগে থেকেই ধরে আছে, এখন আরও গাঢ় হচ্ছে।

মহীপতি বলল, "ভাল করেছ। পূজোব সময় একটা ভিড় আসে, তেমন কিছু নয় যদিও, পূজোব পবই আসল ভিড়। এরা পাঁচ-সাতদিন থেকেই পালাবে। দেওয়ালী পর্যন্ত কমই থাকে। তবে এই সময়টাই ভাল।...কোথায় উঠেছ?"

"ওই যে লাইনের ধারে, ওই দিকটায়—", পার্বতী হাত দিয়ে পশ্চিমের দিকটা দেখাল, "বেল-ক্রসিংয়ের ওপাবে, ঠিক যে রাস্তাটা লাইন বরাবর চলে গেছে। তোমাদেব এখানেব নাম আমার মনে থাকে না।"

মহীপতি চিনে নিতে পাবল। "কার বাড়ি? সত্যবাবুদের?"

"কে সত্যবাবু? আমবা এসেছি ভাড়া নিয়ে, বোধ হয় মিথ্যেবাবুব বাড়ি।" পার্বতী এবার গলা তুলে হাসল।

মহীপতিও হেসে ফেলল।

পার্বতী বলল, "আসার সময় শুনেছিলাম বাংলো বাড়ি ভাড়া পেয়েছি, এসে দেখলাম, ওমা বাংলোর কি চেহারা, পা দিতেও ঘেন্না করছিল।"

ততক্ষণে ওরা দলের কাছে পৌঁছে গেছে।

মহীপতিকে ওরা দেখছিল। বোধ হয় ইতিমধ্যেই কিছু কথাবার্তা হয়েছে নিজেদের মধ্যে, বিস্ময় এবং কৌতূহল সবার চোখেই স্পষ্ট করে দেখল।

পার্বতী হেসে বলল, "এই নাও, নিয়ে এলাম। কই আমার বাজির টাকা কে দিচ্ছ দাও।"

রবি গলা ঝেড়ে কেশে বলল, "কথা ছিল তুমি জল চেয়ে খাবে।"

পার্বতী চোখ কুঁচকে বলল, "বাঃ, মানুষটাকেই যখন ধরে আনতে

পারলাম তখন জল চেয়ে খাওয়া কি অসাধ্য ছিল।"

"না, তা নয়; তবে বাজির কন্‌ট্রাক্‌ট্‌ তুমি মাননি।"

"মানিনি—, ইয়ার্কি! টাকা বের করো,…", পার্বতী কৃত্রিম ধমক দিল।

রবি দু পা সরে গেল, "বাজি ইজ্‌ বাজি, তুমি বাজির শর্ত না মানলে সব ক্যানসেল্‌ড্‌। তোমায় তো আমরা ধরে আনতে বলিনি পাবিদি…।"

মহীপতি এবার হেসে বলল, "উনি আমায় ধরে আনেননি বেঁধে এনেছেন।"

পার্বতী ভাঙা খোঁপা দুলিয়ে বলল, "নাও হল তো।…এবার তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। এই বেঁধে-আনা ভদ্রলোকটি আমার পুরোনো বন্ধু, নাম মহীপতি চৌধুরী," বলে পার্বতী দলের দিকে তাকিয়ে মাস্টারনীর মতন হাসল, পরেই আবার গম্ভীর মুখ, "তোমরা যে ভেবেছিলে এম. চৌধুরী নিশ্চয় কোনো বেহারী হবেন, মথুরাপ্রসাদ চৌধুরী কি ওই রকম কিছু, তা নয়। এঁকে আমি কাল বিকেলেই দেখেছি, আজ একবার সন্দেহটা মিলিয়ে নিলাম।"

মহীপতি পরিচয়-পর্বের সূত্রপাতে নমস্কার করল হাত তুলে।

পার্বতী মহীপতির দিকে তাকিয়ে বলল, "আর এরা—ওই উনি হলেন আমার ভগ্নীপতি—শশধর পালিত; আর ও হল আমার শুধু পতি। রবি আমার সম্পর্কে দেওর, ডাকে দিদি বলে; আর ও-কে তুমি দেখেছ, তখন অবশ্য পেনি ফ্রক পরত, আমার বোন এলা।" বলে পার্বতী সহাস্য মুখে বাচ্চা ছেলেটার দিকে তাকাল। "তুমি কে বাবা, বলো তো!"

"সেন্ট পৌল," বাচ্চাটা বলল।

সমস্বর হাসি উঠল।

পার্বতীর যিনি পতি, অর্থাৎ ফরসা গোলগাল চেহারার মানুষটি বলল, "ওর নাম সন্তু। স্কুলে দিদিমণিদের কাছে রোজ বাইবেলের গল্প শুনতে শুনতে বেচারার সেন্ট হবার ইচ্ছে হয়েছিল খুব। তা

ওর মা ওকে সেন্ট করে দিয়েছে। আমরা থাকি শ্যামবাজারে, পল স্ট্রীটে। সেই হিসেবে ছেলে আমার পল স্ট্রীটের সেন্ট বা সন্ত।”

আবার একদফা হাসি। সেন্ট পৌল বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হল না, বরং ওর মার কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়াল। মহীপতি আদর করে সন্তর মাথার চুল ঘেঁটে দিল।

এলা বলল, “সন্ত তোর বাবার নাম বল্।”

“ফাদার পূর্ণেন্দু।”

এলা সরু গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল। রবিও হাসছিল।

পূর্ণেন্দু বলল, “ছেলে আমার ওএল্ ট্রেণ্ড্।”

মহীপতি হাসাহাসি শেষ করে এলাকে দেখছিল। এই কি এলা? সত্যি চেনা যায় না, চেনার উপায়ও নেই। মহীপতি যখন দেখেছে, তখন এলা একেবারেই বাচ্চা, ছিপছিপে চেহারা ছিল, পেনি ফ্রক না হোক হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো ফ্রক পরত, নাকটা ছিল লম্বা, থেকে থেকে টনসিলের জ্বরে ভুগত, আর আজ সেই এলা তরুণী, তাকে ঠিক সালোয়ার কামিজ মানায় না, চোখে বেয়াড়া লাগে। হয়ত শখ করে পরেছে। বাইরে বেড়াতে এসে কত রকম শখ কত জনেই দেখায়।

এলাকে দেখতে দেখতে মহীপতি হেসে বলল, “এলাকে চেনা যায় না।”

এলা সলজ্জ হাসল, বুকের কাছে উড়নিটা আরও গুছিয়ে নিল সতর্কভাবে।

শশধর দূরে ঝোপ জঙ্গল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, “সবই তো হল, কিন্তু আমাদের আজ কি আর নদী যাওয়া হবে, রোদ চড়ে উঠছে!”

রবি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। “আরে, বাঃ! নদী দেখতেই আসা, যাওয়া হবে না মানে! চলো, চলো, আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।” বলতে বলতে পা বাড়াল রবি, মহীপতিকে লক্ষ্য করে বলল, “আর কতটা পথ বলুন তো?”

মহীপতি বলল, “প্রায় এসে পড়েছেন, সামান্য আর,···ওই যে দূরে জোড়া গাছ, তারপরই নদীর পাড়।”

পুরো দলটাই হাঁটছিল আবার।

মহীপতি সামান্য অপেক্ষা করে বলল, “আপনারা এগোন, আমি ফিরি।···ফেরার পথে নিশ্চয় জলতেষ্টা পাবে, তখন যদি এই গরীবের বাড়ি ঘুরে যান···”

“আপনি আছেন তো বাড়িতে?”

“খানিকক্ষণ থাকব,” মহীপতি কুণ্ঠিত হয়েই যেন বলল, “আমার একটা জরুরী কাজ ছিল, তবু আপনাদের জন্যে খানিকটা অপেক্ষা করব।”

পার্বতী চোখ তুলে মহীপতিকে দেখল। “আমাদের ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি কি অপেক্ষা করতে পারবে। বরং তুমি আজ কাজেই চলে যাও। বাড়িতে বলে যেও, তেষ্টা পেলে ডাকাডাকি করব।”

মহীপতি বলল, “ভবু দেখ; আমি খানিকক্ষণ আছি।”

মহীপতি ফিরল, ওরা সামনের দিকে, মেঠো পথ ধরে নদীর দিকে এগুতে লাগল। রোদ বেশ চড়ে উঠছে।

যেতে যেতে রবি বলল, “তুমি জোর একটা সারপ্রাইজ্ দিলে পাবিদি। আমরা থ' মেরে গিয়েছিলুম।”

পার্বতী কৌতুক অনুভব করে হাসছিল। বলল, “আরও কত সারপ্রাইজ্ আছে দেখো না।”

“মানে? ভদ্রলোক কি ম্যান্ অফ্ সারপ্রাইজেজ্?”

পার্বতী হেঁয়ালি করে জবাব দিল, “কি করে বলব, আমি কি ভদ্রলোকের কথা বলছি। দেখো না এই ঘাটশিলায় কত রকম সারপ্রাইজ্ হয়!”

শশধর সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করল, “ভদ্রলোক কি করেন?”

“কি জানি।”

"বাড়িটা দিব্যি করে রেখেছেন।···ছোটর ওপরেও ডিসেন্ট্ লুকিং।"

পূর্ণেন্দু বলল, "আমাদের ওই রকম একটা বাড়ি জুটলে হত। একেবারে নিরিবিলি,···"

পার্বতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, "থাকতে পারতে না। অভ্যেসের বাইরে একটু আধটু আমাদের সয়, বেশি নয়।"

সন্ধ্যের দিকে মহীপতি এল। এসে দেখল বাড়িতে কেউ নেই। পেছনের দিকে কুঠরি মতন একটা ঘরে বাতি জ্বলছিল। মহীপতির সাড়া পেয়ে মাঝবয়সী এক রাঁধুনী বামুন বেরিয়ে এল, এসে বলল, বাড়ির বাবুটাবুরা বেড়াতে বেরিয়েছে। মহীপতি মুহূর্ত কয় অপেক্ষা করল, ফেরার সময় হয়ে এসেছে ওদের, হয়ত এসে পড়বে এখুনি।

বাড়ির সামনে এসে মহীপতি খানিকটা পায়চারি করল।

॥ দুই ॥

পার্বতী যতটা বলেছিল, ততটা তার মনে হচ্ছে না, বাড়িটা কিছু পুরোনো, খোলার চাল মাথায়, নয়ত তেমন একটা খারাপ কিছু নয়। অব্যবহারের জন্যে কিছুটা ঝোপ-জঙ্গল, খানিকটা মালিন্য, এ আর কোথায় না থাকে! বাড়ির সামনে কাঁটালতার বেড়া, শিউলি ঝোপ একপাশে, গন্ধরাজ আর আতা ঝোপ পাশাপাশি, কলাবাগানের গায়ে পেয়ারা গাছ, কুয়াতলা। বড় বড় ঘাস রয়েছে মাঠে। সামনেই রেল লাইন।

মহীপতি পায়চারি করতে করতে বাইরে এসেছিল। কাল পূর্ণিমা ছিল, আজও যেন ছোঁয়া লেগে আছে, ঝিমঝিমে জ্যোৎস্না ফুটেছে। বুনো ঝোপঝাড় আর টিলার ঢেউ দুপাশে, ওদিকে রাত্রের ধানক্ষেতে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, অসাড় রেল লাইন, অনেকটা তফাতে সিগন্যালের লাল আলো একদৃষ্টে চেয়ে।

মহীপতি মন্থর পায়ে হাঁটছিল। আশেপাশের ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলো একেবারে ফাঁকা নয়, কোথাও টিমটিম করে বাতি জ্বলছে, কোথাও বা গলার শব্দ উঠছে। একটা জিপ গাড়ি বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সরকারী ভাড়া বাড়ির পাঁচিল বুঝি নতুন করে গাঁথা, নতুন ইট চোখে পড়ছিল। কাঁচা সুরকির গন্ধ উঠছে কোথাও।

সামান্য হেঁটে এসে মহীপতি দাঁড়াল। ওই বোধ হয় ফিরছে ওরা। খানিকটা দূর বলে দেখা বা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু একটা দল আসছে। মহীপতি দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্রমেই নানা গলার স্বর কানে আসতে লাগল। মহীপতি স্পষ্ট করে কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, শুধুমাত্র একটা কলরব তার কানে আসছে। বোধ হয় এমন একটা কথা উঠছে যে দলের সকলেরই কণ্ঠ সরব।

গায়ের পাশ দিয়ে একটা জোনাকি উড়ে গেল, শূন্যে বারকয়েক

পাক খেয়ে বুনো লতায় গিয়ে বসল, আবার উড়ল।

এতোক্ষণে মহীপতি ওদের দেখতে পাচ্ছে : শশধর, পূর্ণেন্দু, রবি, পার্বতী,...। এলা শাড়ি পরেছে। কিন্তু আরও একজন যেন শাড়ি পরা, ও কে? সন্তু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছিল, রবি অট্টহাস্য হাসছে।

কাছাকাছি এসে পড়েছিল ওরা। পার্বতী খানিকটা এগিয়ে।

"ওমা, তুমি—", পার্বতী সামনে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল, "এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছ?"

মহীপতি বলল, "তোমাদের বাড়ি গিয়ে শুনলাম, বেড়াতে বেরিয়েছ; অপেক্ষা করছিলাম।"

রবি হাত জোড় করে সহাস্য মুখে বলল, "প্রথমেই স্যার, আপনার কাছে মাপ চেয়ে নিই। সকালে নদী ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম। তারপর দেখি, আর একটা দল ওদিক দিয়েই ফিরছে, আমরাও তাদের পেছন পেছন ফিরতে লাগলুম। ফিরে দেখি, যা বাব্বা একেবারে অন্য জায়গায় হাজির। আপনার বাড়িতে আর জল খেতে যাওয়া হল না। ভেরী সরি।"

মহীপতি হেসে বলল, "আমিও বেশিক্ষণ বাড়িতে থাকতে পারিনি।"

"যাক বাঁচালেন। আমবা ভাবছিলাম, আপনি ওয়েট্ করে করে বেজায় চটে যাবেন।"

"না।" মহীপতি মাথা নাড়ল আস্তে করে।

পার্বতী বলল, "তুমি সকালে একজনকে দেখোনি," বলে নতুন মানুষটির দিকে তাকাল, বাসনাদি, আমার মামাতো দিদি, শশধরবাবুর ধর্মপত্নী—", বলে হাসিমুখে ভগ্নীপতির দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করল পার্বতী। বাসনা সামান্য সরে দাঁড়িয়েছিল।

মহীপতি কয়েক পলক দেখল বাসনাকে। চোখে কিছুটা বিস্ময়। যথারীতি নমস্কার করল।

"দিদি, এই ভদ্রলোকই সেই মহীপতি, সকালে যার কথা বলছিলাম।"

"চিনেছি," বাসনা বলল।

পূর্ণেন্দু বলল, "দাঁড়িয়ে লাভ কি, চলো।"

• প্রায় গায়ে গায়ে সকলেই চলতে লাগল বাড়ির দিকে।

মহীপতি শশধরকে জিজ্ঞেস করল, "কোন্ দিকে গিয়েছিলেন বেড়াতে ?"

"গিয়েছিলাম অনেকটা, ফেরার পথে স্টেশন হয়ে ফিরছি।"

"কেমন লাগছে ?"

"ভাল। জলটা বেশ ভাল।"

পূর্ণেন্দু বলল, "আমার কিন্তু খানিকটা ভেজা-ভেজা লাগছে, ড্যাম্প। সে রকম ড্রাই মনে হচ্ছে না।"

মহীপতি বলল, "পুজোর সময় বৃষ্টি-বাদলা হয়ে গেছে, কালও মেঘ করেছিল আকাশে। এই বাদলাটা কেটে গেলেই শীত পড়বে, ড্রাই হবে।"

"আপনি কতদিন আছেন এখানে ?"

"দিন কি বছর বলো", রবি পূর্ণেন্দুকে শুধরোতে গেল।

মহীপতি বলল, "তা বেশ কিছুকাল হল, বছর ছ' সাত।"

পার্বতী ঘাড় তুলে মহীপতিকে শুধলো, "বছর ছ' সাত কি ? তার আগে আবার কোথায় ছিলে ?"

"অন্য জায়গায়", মহীপতি মৃদু হাসল, "বিহারেই।"

"বাংলা দেশ বরাবরের মতই ছেড়ে দিয়েছ তাহলে ?"

"না, ছেড়েছি কোথায় ! ঝাড়গ্রাম প্রায়ই যেতে হয়। ওটা বাংলা দেশ।"

"ও, তার ওপারে বুঝি যান না ?" রবি শুধলো।

"কখনও-সখনও খড়্গপুরে যেতে হয়।"

"কলকাতায় নয় ?" ওপাশ থেকে বাসনা বলল।

"না।"

শশধর সামান্য সরে গিয়ে বাসনার কাছে এল। নীচু গলায় কিছু বলছিল।

রবি বলল, "এখানে আপনি কি করেন, স্যার ?"

মহীপতি সাধারণ ভাবে জবাব দিল, "একটা ব্যবসার মতন আছে।"

"কিসের ?"

"কাঠের।"

এলা সন্তকে বকছিল, সন্ত একলা ঝোপের দিকে চলে যাচ্ছিল বার বার, এলা বলছিল, পরিষ্কার রাস্তা দিয়ে যেতে বলছি না, সাপেখোপে কামড়াবে যখন তখন বুঝবি।

সাধারণ, এলোমেলো কথা বলতে বলতে ওরা বাড়ি পৌঁছে গেল।

বাগানের সামনেই দাঁড়াল পার্বতী, এলাকে বলল, "তুই গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর, আমি এখানে দাঁড়াই খানিক।"

বাসনা আগেই কয়েক পা এগিয়ে গেছে, সঙ্গে শশধর। এলা সন্তকে নিয়ে এগিয়ে গেল। পূর্ণেন্দু আর রবিও নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে এগোল, মনে হল ওরা তাদের কথা বলছে।

পার্বতী হেসে বলল, "চললো সব তাসের আড্ডায়। কী তাসটাই খেলে, সকাল সন্ধ্যে মানে না। ও রবি, শুনছ, তাস নিয়ে বসবে বসো গলাবাজি করবে না।"

রবি যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে জবাব দিল, "আমায় বলছ কেন, আমার গলা কোথায়! তোমরা ত বাবা কেটে ছেড়ে দিয়েছ।···ও স্যার, আপনিও কি বে-তাস ? না হলে চলে আসুন। কিছু ইন্‌কাম হয়ে যাবে।"

পার্বতী হাসছিল।

মহীপতি বলল, "ভদ্রলোক বেশ ফুর্তিবাজ।"

"ভদ্রলোক বলছ কাকে, রবিকে! আরে রাম, ও ছোঁড়াও ভদ্রলোক হয়ে গেল ? মস্ত পাজি ওটা।" পার্বতী সরল স্নেহের গলায় বলছিল। সামান্য থেমে আবার বলল, "আজ ওর পকেট থেকে আট দশ টাকা খসিয়ে এইমাত্র সব মিষ্টিটিষ্টি খেয়ে আসছে, শুনলে না কেমন বলল, আমরা ওর গলা কেটে ছেড়েছি।"

মহীপতি নীরব থাকল না, মৃদু গলায় হাসল সামান্য।

তারপর চুপচাপ। পার্বতী আলস্যের বশে নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে,

সামান্য বেঁকে শিথিল ভঙ্গিতে দাঁড়াল, আকাশ দেখল কয়েক পলক।

মহীপতি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাল।

খানিকটা স্তব্ধতার পর পার্বতী আচমকা বলল, "তারপর ?"

মহীপতি মনে মনে অনুভব করল, এই তার পরের একটা অর্থ আছে। ওটা নিতান্তই ভূমিকা নয়, বাহুল্য নয়।

মহীপতি বলল, "তারপর আর কি! তোমার সঙ্গে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।"

"আমিও নয়। ··কিন্তু তুমি ভাবলে না কেন ? এরকম জায়গায় আছ; কলকাতার এত কাছাকাছি; শয়ে শয়ে বাঙালী আসছে ছুটি কাটাতে, বেড়াতে, আর আমরা কি একবার এসে পড়তে পারি না!"

মহীপতি লক্ষ্য করে দেখছিল পার্বতীর গলার স্বরের কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে কিনা। বয়সেই হয়ত, পার্বতীর গলার স্বর অল্প মোটা হয়েছে, এখন আরও গাঢ়, নরম মনে হয়। যতদূর মনে হচ্ছে, আগে পার্বতীর গলার গাঢ়তার অভাব ছিল, হয় তরল না হয় রুক্ষই লাগত। কিংবা বেশি ঘনিষ্ঠ। স্বরের এই পার্থক্য তেমন যে স্পষ্ট হয়ে মহীপতির কানে ধরা পড়ল তা নয়, তবু মহীপতির এখন সেরকম মনে হল।

মহীপতি বলল, "কখনও-সখনও মনে হত—"

"তবে আর কি, দেখা হয়ে গেল।"

সিগারেটের একমুখ ধোঁয়া জলের মতন করে গিলে ফেলল মহীপতি। অল্প তফাতে পার্বতীদের বাড়িতে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল, এঘরে ওঘরে, কুয়াতলার দিকে বাতাসের দমকা লেগে কলাপাতায় শব্দ হচ্ছে।

মহীপতি বলল, "অনেক বছর পরে দেখা, না ? এক যুগ প্রায়।"

"দশ তো হবে।"

"দশ তো হবেই।" মহীপতি নড়েচড়ে ঘুরে দাঁড়াল, পার্বতীর মুখোমুখি।

"তুমি বছর ছয় এখানে আছ, না ?"

"ছয় শেষ হল।"

"আগের চার বছর কোথায় ছিলে?"

"অন্য দিকে, চাঁইবাসাতেও কাটিয়েছি কিছু দিন।"

"কি করতে? কাঠের ব্যবসা?"

"না, কাঠের ব্যবসাটা এখানে এসেই শুরু করলাম। তার আগে কখনও চাকরিবাকরি করেছি, কখনও অন্য কিছু।"

"আমার বিয়ে হয়েছে বছর ছয় হল", পার্বতী আচমকা বলল।

মহীপতি বোধ হয় কথাটা এভাবে প্রত্যাশা করেনি। পার্বতী কি বলতে চাইল বোঝার চেষ্টা করল মহীপতি। "বিয়ের পর মেয়েরা মোটা হয়, তুমি হওনি।" মহীপতি ইচ্ছে করেই পার্বতীর কথা থেকে সরে আসার জন্যে হালকা হবার চেষ্টা করল, মৃদু হাসল।

"মোটা হইনি কে বলল? বেশ হয়েছি।"

না, খুব সামান্য। ওটা কিছু নয়।...তুমি যেটুকু বদলেছ তা মুখে। মুখ তোমার খুব—কি বলব—কাটাকাটা, মানে শার্প ছিল। এখন দেখছি, পুরন্ত মতন।"

"মানে ভোঁতা?" পার্বতী হাসল।

"না না, ভোঁতা নয়," মহীপতি মাথা নাড়ল, "ভোঁতা আমি বলিনি।"

পার্বতী মাটির দিকে তাকাল, বলল, "ঘাস ভিজে রয়েছে, নয়ত খানিক বসতাম। বাবা, তোমাদের এই জায়গায় হাঁটা বড় কষ্টের, এই উঁচু, এই নীচু। আমার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। আজ কম হাঁটলাম না।"

আশপাশ দেখে মহীপতি বলল, "বসতে হলে তোমায় বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত যেতে হয়।"

পার্বতী কথাটা কানে নিল না, অন্যমনস্ক হয়ে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মহীপতিও চুপচাপ, থেমে থেমে সিগারেট টানছিল।

শেষ পর্যন্ত পার্বতী কথা বলল, "কলকাতার খবরটবর কিছু রাখো?"

"তেমন কিছু নয়—।"

"অমরেশদা মারা গেছে, জানো ?"

• "জানি।"

পার্বতী মহীপতির চোখের দিকে তাকাল। "আর কিছু জানো না ?"

মহীপতি যেন কুণ্ঠিত হল, বলল, "শুনেছি অমরেশদার স্ত্রী ভালই আছে।"

"কোথায়, কার কাছে আছে জানো না ?"

মহীপতি প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইছিল। বলল, "আমার সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। এখানে পুরোনো কেউ এলে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায় যদি দৈবাৎ তবেই যা শুনি।...যাকগে, তোমার কথা বলো।"

পার্বতী আলস্যের পায়ে সামনে হাঁটল, থামল, আবার ফিরে এল। "আমার সম্পর্কে তোমার উৎসাহ এখনও আছে নাকি ?"

মহীপতির মনে হল, পার্বতী যথাসম্ভব নিস্পৃহভাবে কথাটা বলার চেষ্টা করলেও তার গলায় চাপা পরিহাস আছে। মনে মনে এই পরিহাস সয়ে নিল মহীপতি। সহজ করে বলল, "আমাকে খুঁজে বের করতে তুমি অনেক বেশি উৎসাহ দেখিয়েছ।"

"বাঃ!" পার্বতী কি রকম বিমূঢ় বোধ করল, মহীপতির মুখের চাপা হাসি লক্ষ্য করতে করতে বলল, "চেনাশোনা লোক দেখলে খোঁজ করব না ?"

"করেছ বলেই বলছি—", মহীপতি বলল, "তোমার উৎসাহ বেশি।"

পার্বতী খানিক চুপ করে থাকল, ভাবল কিছু, বলল, "আমার উৎসাহ বরাবরই একটু বেশি ছিল।"

মহীপতি সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল। অল্প সময় নিল, যেন পার্বতীর কথার পর একটা ছেদ দিল। বলল, "তোমার বাবা কোথায় আছেন ?"

পার্বতী চোখ তুলে মাথার ওপর আকাশ দেখাল।

মহীপতি অন্যমনস্ক হল। "মা ?"

"মা আরও আগে; বোধ হয় তোমার কলকাতা ছাড়ার মাস কয়েক পরেই।"

নিশ্বাস ফেলল মহীপতি। দূরে একটা ট্রেন আসার শব্দ উঠেছে। পার্বতীদের বাড়ি থেকে আচমকা গান ভেসে এল, রেডিয়ো চালিয়ে দিয়েছে কেউ।

হালকা ভাবে মহীপতি বলল, "এখন তা হলে মন দিয়ে ঘর-সংসার করছ?"

"করছি।"

"খুশী?"

"অখুশী বললে কি আমার জন্যে কাঁদতে বসবে…?" পার্বতী ঠাট্টা করে বলল। বলে অকারণে হাসল।

মহীপতিও হেসে বলল, "বললেও বিশ্বাস করতে পারব না। স্বচক্ষেই দেখছি…"

"কি দেখছ? আমাকে?"

"তোমাকে, তোমার স্বামীকে, ছেলেকে…"

পার্বতী কৌতুকের চোখে মহীপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চিবুকের তলা পর্যন্ত কোনো রহস্যজনক হাসি গড়িয়ে এসেছে।

মহীপতি জ্যোৎস্নার আলোয় অতটা লক্ষ্য করল না। বলল, "তুমি ঘরসংসার করে সুখী সন্তুষ্ট হয়েছ দেখে ভালই লাগছে।"

পার্বতী দু পলক যেন আরও গভীর করে মহীপতিকে লক্ষ্য করল, তারপর আচমকা বলল, "নিজের পাপের ভার খানিকটা হালকা হচ্ছে বুঝি!"

মহীপতি হঠাৎ কি রকম চমকে গেল। পালানো চোর আচমকা পুলিসের হুইসলের মুখোমুখি পড়ে যেরকম সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে মহীপতি অনেকটা সেই রকম সন্ত্রস্ত হল। অনেক কষ্টে এই শঙ্কিত সন্ত্রস্ত ভাব কাটিয়ে সে বলল, "আমার পাপের ভার!…কি জানি, হবে হয়ত।"

"কথাটা তোমার মনে খুব ভাল লাগল, না?"

"না লাগার কি?"

"আমার কিন্তু বরাবরই একটা কথা মনে হয়েছে। তুমি চোরের

মতন পালিয়ে গেলে কেন ? বলে কয়ে যেতে পারতে।”

মহীপতি নিরুত্তর। পার্বতীকে সে দেখছিল না।

পার্বতী কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলল না। পরে বলল, “আমি গোড়ায় গোড়ায় ভাবতাম, তুমি আবার একদিন ফিরে আসবে। ছেলেমানুষি আর কি! পরে আর সে আশা করি নি। আবার একটা বিয়ে করলাম, এবার আর লুকোচুরি করে নয়। বিয়ে করে আমার লাভই হল, নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের দিকে তাকাতে পারলাম।”

মহীপতি বলার মতন কথা খুঁজে না পেয়ে এবং নীরব থাকা সম্ভব হল না বলে বলল, “তাহলে তোমার ক্ষতি কিছু হয়নি, বরং লাভ হয়েছে—।”

“হ্যাঁ, লাভই হয়েছে। বিয়ের গায়ে-গায়েই কলকাতা শহরের অমন জায়গায় একটা বাড়ি, বোকাসোকা ভালমানুষ গোছের একটা পুরুষমানুষ, আর ওই বাচ্চা—একদিনেই তিন-তিনটে পাওনা, সোজা লাভ নাকি ?” পার্বতী হাসতে লাগল আপন মনে।

মহীপতির কানে কথাটা লেগেছিল। সন্দেহভরে জিজ্ঞেস করল, “বাচ্চা ? একই দিনে বাচ্চাটাকেও পাও কি করে ?”

পার্বতী এবার গলা আকাশের দিকে তুলে জোরে হেসে উঠল। “আমি পেটে বয়ে নিয়ে যাই নি। তোমার বুঝি ভয় ধরে গিয়েছে শুনে!···না গো মহীপতিবাবু, তোমার ভয়ের কিছু নেই। সন্ত অন্যের পেটে ধরা ছেলে, যার পেটে এসেছিল, সে মরে গেছে, আমি তার জায়গা, তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম একদিন। ব্যাস্, সব আমার হয়ে গেল।”

মহীপতির মনে হল, পার্বতীর সর্বাঙ্গ চাপা হাসিতে কাঁপছে। রেল গাড়িটা কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

॥ তিন ॥

ঘুম ভেঙে উঠে রবি বাইরে এসে দেখল, চারপাশ ফরসা হয়ে গেছে। আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল, রাতের মালিন্য প্রায় পরিষ্কার হয়ে সকাল ফুটেছে। পাখিরা ঘুম ভেঙে ডাকাডাকি শুরু করেছিল অনেকক্ষণ, এখন একে একে উড়ে যাচ্ছে। গাছপালা শান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, সারা রাতের হিমে মাঠ-ঘাট ভিজে। রবি চারপাশ তাকিয়ে দেখে কুয়াতলার দিকে পা বাড়াতেই পার্বতীকে দেখল। নীচু বেড়ার পাশ দিয়ে পার্বতী আসছে।

"একি, এত সকালে তুমি?" রবি বলল।

পার্বতী বলল, "ভোরে ভোরে আজ উঠে পড়েছি।"

"বেশ করেছ; কিন্তু ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

"কুয়া থেকে মুখেচোখে জল দিয়ে এলাম।" বলে পার্বতী কী মনে করে যেন সামান্য কৈফিয়ৎ দিল, "কুয়ার টাটকা জল!"

"বলো কি, জল তুললে?"

"আহা, হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যায়···।"

রবি শব্দ করে হাই তুলে সকালের বাকি আলস্য কাটিয়ে দিল। বলল, "উঠে যখন পড়েছ তখন চলো খানিকটা মর্নিং ওয়াক্ করে আসি। কী রকম ফ্রেশ লাগবে দেখো।"

এখানে এসে পর্যন্ত রবি প্রাতঃভ্রমণের অভ্যেস করেছে। এক-আধদিন তার সঙ্গী জুটলেও এখন আর সাত সকালে ভোরের ঘুম ছেড়ে কেউ বিছানা ছাড়তে রাজী না। ডাকাডাকি করেও কাউকে পাওয়া যায় না। রবি একা-একাই সকালের দিকটা খানিক ঘুরে বেড়ায়, গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করে, পায়ে শিশির মাখে, সূর্যোদয় দেখে, কখনও-সখনও এর তার বাড়ির পাঁচিলে হাত বাড়িয়ে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে আসে।

পার্বতীকে সঙ্গী হিসেবে হঠাৎ পেয়ে গিয়ে রবি বেশ খুশী হল।

বলল, "নাও তুমি এসো, আমি চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসি।"

পার্বতী ঘরের দিকে পা বাড়াল, রবি কুয়াতলার দিকে।

সামান্য পরে দুজনেই বেরিয়ে পড়ল। ঘরের দরজা ভেজানো, আসার সময় ঠাকুরটাকে জাগিয়ে দিয়েছে রবি। পার্বতী রাতের বাসি শাড়ির আঁচল পিঠে বুকে জড়িয়ে নিয়েছিল। ভোরের দিকে পাতলা শীতের ভাব থাকে, গা সিরসির করে। ঘাস লতাপাতার ভোরের চেহারা দেখলে মনে হয়, ভোর রাতে বুঝি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হয়ে সব ভিজে গেছে। কুয়াশার মতন সাদা প্রলেপ তখনও শূন্যে জড়ানো।

রবির পরনে পাজামা, গায়ে তাঁতের রঙীন পাঞ্জাবি ; গলার কাছে একটা তোয়ালে জড়ানো। মুখ মুছে তোয়ালেটা আর রেখে আসে নি, গলায় জড়িয়ে নিয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডায় মাঝে মাঝে তার গলা খুসখুস করে ওঠে বলেই বোধ হয়।

শিউলিতলায় অজস্র শিউলি ঝরে আছে, খুব ফিকে একটা গন্ধ পাওয়া যায় নাক টানলে। ঝরা ফুল ডিঙিয়ে ওরা বাড়ির সীমানা পেরিয়ে এল।

রবি বলল, "কোন্ দিকে যাবে ?"

পার্বতী সকাল দেখছিল যেন, বলল, "যেদিকে খুশি চলো।"

এদিক ওদিক তাকিয়ে রবি বলল, "চলো তা হলে মাঠের দিকে যাই ; মাঠে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখব।" বলে রবি হাসল ; সূর্যোদয় শব্দটা সে রগড় করে উচ্চারণ করেছিল।

পার্বতী হাঁটতে লাগল। এই স্নিগ্ধ সতেজ ভোর তার ভালই লাগছিল। শীতের স্পর্শ লাগছিল কদাচিৎ। শিশির ভেজা মাটি ও লতাপাতার গন্ধে প্রত্যূষের অচঞ্চল বাতাস মনোরম হয়ে আছে, নিমের জঙ্গল থেকে এক ঝাঁক পাখি আকাশে উড়ে গেল, জামপাতা খসে পড়ছিল, এত সকালেও ফড়িং পথে পথে ঘাসের ডগা ছুঁয়ে উড়ছে।

পার্বতী বলল, "দেখতে দেখতে শীত পড়ে যাচ্ছে, না?"

রবি মাথা হেলিয়ে সায় দিল। "কালীপুজো নাগাদ শীত পড়ে যাবে।"

পার্বতীরও সেই রকম ধারণা।

আরও কয়েক পা হেঁটে এসে পার্বতী বলল, "আমি ভাবছি তার আগেই কলকাতায় ফিরব।"

রবি তাকাল। "কেন? দেওয়ালী পর্যন্ত আমরা থাকছি।"

আকন্দ ঝোপ পেরিয়ে সটান রাস্তা, পায়ে চলা পথ, দু পাশে ঢালু জমি। পার্বতী বলল, "কাল আমার খুব খারাপ লেগেছে।"

রবির মুখ সামান্য আড়ষ্ট হল। কথা বলল না।

পার্বতী ধীরে ধীরে হাঁটছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, আলস্য নাকি অন্য কোন কারণে পার্বতীকে খানিকটা উদাস দেখাচ্ছে। রবির মনে হল, কালকের ঘটনা এখনও পাবিদিকে অপ্রসন্ন করে রেখেছে।

রবি ইতস্তত করে বলল, "একসঙ্গে এসেছি, এখন আর রাগ করে লাভ নেই।"

"কোন দরকার ছিল না একসঙ্গে আসার", পার্বতী বলল, "আমি রাজী হই নি। বারণ করেছিলাম বার বার—"

রবি কিছু বলতে পারল না। কালকের ব্যাপারটা তারও পছন্দ হয় নি। শশধরদা এবং বাসনাদির আগের অনেক কিছুই তার ভাল লাগে নি, মনে মনে সে বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু কালকের ব্যাপারটা সহ্য করে যাওয়া সত্যিই মুশকিল।

"ওদের কাণ্ডজ্ঞান কোনো কালেই নেই, বরাবর নোংরামি করে এসেছে", পার্বতী বিরক্তির গলায় বলল, "জেনে শুনেও তোমার দাদা আদর দেখিয়ে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনল।"

রবি আপত্তি করার কোনো কারণ দেখল না। শশধর এবং বাসনা সম্পর্কে তার ধারণা ভাল নয়। যথেষ্ট মেলামেশাও সে এদের সঙ্গে করে নি। এমন কি, সে যতটা জানে তাতে মনে হয়, আচমকা

একটা উপসর্গের মতন এরা দুজনে পার্বতীদের সংসারে এসে জুটেছে। কেন এসেছে রবি হয়ত তাও খানিকটা অনুমান করতে পারে।

খানিকটা ফাঁকা মাঠে নেমে এল ওরা। শালের চারা আর শক্ত লাল মাটি, একদিকে কিছু পাথর নুড়ি জড় করা, মস্ত একটা বেল গাছ। নদীর দিক থেকে বাতাস বয়ে এল এক দমকা।

রবি বলল, "কালকের ব্যাপারটা আমারও খারাপ লেগেছে, পাবিদি; কিন্তু কি করা যাবে!"

পার্বতী বলল, "সারা রাত আমার কাল ঘুম হয় নি।" বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "আমি ঠিক করেছি, আজ আমি স্পষ্ট করে ওদের বলে দেব, হয় ওরা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকুক, না হয় আমরা।"

রবি খানিকটা ভয় পেল। পার্বতীর চরিত্র খানিকটা সে জানে। মাথায় কোনো জেদ চেপে বসলে ওকে আর নোয়ানো যায় না। আবার কি একটা গোলমাল বাধে এই আশঙ্কায় রবি পার্বতীকে নরম করার চেষ্টা করল। বলল, "সেটা কি ভাল হবে? হাজার হোক তোমাদের গেস্ট!"

"আমি তাতে কৃতার্থ হই নি।" পার্বতী ঝাঁজের গলায় বলল।

কালকের ব্যাপারটা যে তাচ্ছিল্য করার মতন নয় রবিরও তাতে সন্দেহ নেই। রবি খুব কাছাকাছি থেকে শশধর ও বাসনাকে আগে দেখে নি, আজ কদিন দেখছে। দেখে তার কোনো কোনো ধারণা নিশ্চয় পালটে যাচ্ছে। কিন্তু কাল যা হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। একমাত্র বাঁচোয়া এই যে, ঘটনাটা কিছুটা রাত্রে ঘটেছিল, সন্তু জেগে ছিল না—ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর মহীপতিও এ বাড়িতে ছিল না। সন্তু জেগে থাকলে কি দেখত, কি ভাবত—ভাবলেই লজ্জায় মুখ কান আগুন হয়ে যায়। মহীপতিও যদি দেখত, কলকাতার এই দলটিকে কি ভেবে নিত কে জানে! এলা অবশ্য দেখেছে, শুনেছে। ঠাকুরটাও দেখল, বাবুবিবিদের কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল।

কাল বেশিক্ষণ তাস খেলা হয় নি। শশধরের মন ছিল না,

বাসনাও হাতের তাস নিয়ে খেলার চেয়ে আদিখ্যেতাই বেশি করছিল। তাসের পাট তুলে ফেলতে হল। তারপর শশধর স্ত্রীকে নিয়ে তার ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল। শশধর রোজই খানিকটা মদের নেশা করে, এটা তার অভ্যাস। আয়োজনের বিশেষ কিছু প্রয়োজন হয় না, নিছক কুয়ার জল দিয়েই সে হুইস্কি খায়, মাঝে মাঝে দু এক মুঠো ডালসেউ। শশধরকে সেধে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসার সময় পূর্ণেন্দু এটা জানত না তা নয়। ইদানীং পূর্ণেন্দুও মাঝে-সাঝে মদ্য পান শুরু করেছে। এখানে এসেও শশধরের সঙ্গে বসেছে দু-একদিন। কাল অবশ্য পূর্ণেন্দু ছিল না।

ঘরে বসে শশধর নেশা শুরু করার পর ওদিকে কেউ যায় নি। পার্বতী তার নিজের এবং এলার জন্যে প্রান্তের একটা ঘর নিয়ে নিয়েছিল, সন্তুও সেখানে থাকত; মাঝের ঘরে পূর্ণেন্দু আর রবি, মাঝের বারান্দার ওপারে কোণার ঘর শশধরদের।

কি হয়েছিল বোঝা গেল না, খানিক রাত্রে, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা যখন শেষ, শশধরের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে, তখন শশধরদের ঘরের মধ্যে বিশ্রী রকম একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। তার আগে ওদের স্বামী-স্ত্রীর গলা যতটুকু পাওয়া যাচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল, দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া, কথা কাটাকাটি চলছে। এতে অবাক হবার কারণ ছিল না। শশধর এবং তার স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব ও বিরোধের ব্যাপারটা কোনো নিয়ম মেনে চলত না। আজ এই মুহূর্তে শশধর ও তার স্ত্রীর ব্যবহার দেখলে মনে হবে, এমন আদর্শ প্রেমিক, অনুরক্ত দম্পতি আর দেখা যায় না, পর মুহূর্তে উভয়ের অন্য রূপ, দুজনেই স্থান কাল পাত্র ভুলে, মান-সম্মান ভুলে ইতরের মতন ঝগড়া করছে, চেঁচাচ্ছে, গালিগালাজ করছে, এমন কি আঁচড়া-আঁচড়ি, চুলোচুলিও বাদ যাচ্ছে না।

তবু কাল যা হল, তা কল্পনাতীত। চাপা কলহ, বচসা ক্রমে প্রখর হল; তারপর ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব বাধল। রবি আর পূর্ণেন্দু বুঝতে পারছিল না কি করবে, পার্বতী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পার্বতী এসে পূর্ণেন্দুকে বলল, "কি পেয়েছ তোমরা? এটা বাড়ি না ছোটলোকের বস্তি?" রাগে পার্বতীর মুখ লাল, চোখ উগ্র।

পূর্ণেন্দু ভয়ে ভয়ে বলল, "বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে না পারলে হবে কেন? যাও, গিয়ে থামতে বলো।"

পূর্ণেন্দু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে উঠল। রবিও অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে এবং সসঙ্কোচে, অস্বস্তিতে পূর্ণেন্দুর পেছন পেছন কয়েক পা এগোল।

মাঝের বারান্দা পার হয়ে শশধরদের দরজার কাছে আসতেই আচমকা দরজা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খোলা দরজা দিয়ে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল বাসনা। গায়ে কোথাও শাড়ি নেই, বুকের জামা প্রায় খোলা, সায়াটা অঙ্গে আছে। মাথার চুল দেখে এলোকেশী বলে মনে হচ্ছিল, চোখমুখ ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

পূর্ণেন্দু এবং রবি বিমূঢ়, বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পার্বতী সামান্য পিছিয়ে।

বাসনা বোধ হয় কিছু ধরবার চেষ্টা করছিল, দেওয়াল বা অন্য কিছু ধরতে পারছিল না, টলতে টলতে মেঝেতে পড়ে গেল।

ঘর থেকে শশধর মাতাল গলায় চেঁচাচ্ছিল: "বীচ্...ইউ আর এ সোয়েল্‌ন্ বীচ্। তুই কেদার মিত্তিরের বাড়িতে কার্পেটে শুয়ে গড়াগড়ি যাস, আমি জানি না! আমায় তুই জুতো মারবি, তোর ঠ্যাঙ্ চিরে দেব, হারামজাদী কোথাকার।...বজ্জাত মেয়েছেলে, ধুমসী মাগীর পেছনের..."

বাসনা মেঝেতে উবু হয়ে বসে দু হাতে মাটি ধরে ওয়াক তুলছিল। বৃহৎ একটা ব্যাঙের মতন সে বসে। ওয়াক তোলার শব্দ ও শব্দের মধ্যের বিরামে—সে ধরা, ভাঙা গলায় বলছিল, "তোমরা দেখ এসে, আমায় খুন করে ফেলেছে রে! ওরে বাবা রে...। জানোয়ার, জন্তু, চামার...।" বলছিল আর ওয়াক তুলছিল বিশ্রী শব্দ করে। পূর্ণেন্দু ভয় পেয়ে বাতিটা জ্বেলে দিল বারান্দার।

আলোয় বাসনাকে উন্মাদিনীর মতন দেখাচ্ছিল; বীভৎস। তার আঁটো পাতলা জামাটা পিঠের দিকে ছিঁড়ে গেছে, হাতের পাশে

রক্ত। মুখ চোখ আঁচড়ানো, সায়ার হাঁটুর কাছটায় কালা হয়ে ছিঁড়েছে। মনে হচ্ছিল, শরীরের মধ্যে থেকে কিছু উগরে বের করে দিতে পারলে ও বাঁচে। বাসনার যে ভীষণ একটা কষ্ট হচ্ছিল, বোঝাই যায়।

আলোটা না জ্বাললেই ভাল ছিল। দৃশ্যটা ভীষণ দৃষ্টিকটু। পূর্ণেন্দু এবং পার্বতীর সামনে এই দৃশ্য দেখে রবি যেন শিউরে উঠছিল, লজ্জায় অধোবদন।

পূর্ণেন্দু হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলল, "ড্রাংকেন্…"

ঘরের মধ্যে থেকে শশধর ততক্ষণে বেরিয়ে দরজার কাছে এসেছে। শশধরের চেহারা দেখে তাকে বেহুঁশ এবং বিক্ষত দেখাচ্ছিল। দরজাব পাল্লা ধবে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়েছে শশধর।

বাসনা শব্দ করে বমি করতে শুরু করল। বমির সঙ্গে লালা পড়ছে, মুখ হাঁ করে টেনে টেনে দম নিচ্ছে।

পার্বতী নাক-মুখে আঁচল চাপা দিল। কী দুর্গন্ধ!

এলা কাছাকাছি এসে পড়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাছে আসতে বা ফিরে যেতেও পারছিল না।

বাসনা হাত বাড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে জল চাইছিল।

ঠাকুরটাও কোন্ সময়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কারও খেয়াল হয় নি। পার্বতীর চোখ পড়ল হঠাৎ। ইশারায় চলে যেতে বলল।

এলাও শেষ পর্যন্ত পালাল।

দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে শশধর জড়ানো গলায় তখনও চেঁচাচ্ছে, "মুখের কোনো লাগাম নেই, অশ্লীল ইতর নোংরা কথা বলছে।"

বাসনা শেষ পর্যন্ত বমির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল।

পার্বতী আর দাঁড়াল না, চলে যেতে যেতে বলল, "দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তোমাদের আর থিয়েটার দেখতে হবে না, ঘরে যাও, আমি দেখছি।"

রবিরা ঘরে ফিরে গেল।

পরের সমস্ত ঝামেলা পার্বতীকেই সামলাতে হয়েছে। মুখ চোখ মুছিয়ে বাসনাকে তার ঘরে রেখে এসেছে, শশধরকে ধমকে-টমকে থামিয়েছে, বারান্দার বমি ধুয়েছে নিজের হাতে।

সব যখন শেষ হল তখন শশধরদের ঘরে আর কোনো সাড়া শব্দ নেই, অচেতন দুটি মানুষ পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

রাত্রের দৃশ্যটা রবি এই সকালে আবার স্পষ্ট করে মনে করতে গিয়ে দেখল, দুঃস্বপ্নের মতন সেটা তাকে বিরক্ত করছে।

আরও খানিকটা হেঁটে এসেছিল ওরা। আকাশে আলো ফুটে উঠেছে। সূর্য উঠে আসছে।

পার্বতী বলল, "কলকাতা ছাড়ার আগেই আমি জানতাম, এখানে এসে এই সব বেলাল্লাপনা হবে।"

রবি পুব আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল। সূর্য উঠে আসছে।

কি ভেবে রবি বলল, "কালকের বাড়াবাড়ির পর আর কি কিছু করবে ওরা?"

"করবে না! না করলে বাঁচবে নাকি?"

রবি পার্বতীর মুখের দিকে চোখ ফেরাল। "এই কি বাঁচা?"

পার্বতী রবির মুখ দেখল। বলল, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ, কে যে কি ভাবে বাঁচে তুমি জানো না।"

রবি পার্বতীর চোখের দিকে তাকিয়ে কথাটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করল। এসব কথার অর্থ কখনোই স্পষ্ট বোঝা যায় না, কেননা প্রকাশ্যের চেয়ে অপ্রকাশ্যের অংশই এখানে বেশি—অনেক বেশি। তবু রবির মনে হল, শুধু কি শশধরদের কথাই বলল পাবিদি, নিজের কিছু কি বলল না?

রবি কিছু বলল না। সামনের দিকে মুখ করে হাঁটতে লাগল।

আরও অনেকটা বেলায় বিসদৃশ ঘটনাটা ঘটে গেল।

রোদের তাত বাঁচিয়ে গাছতলার ছায়ায় পার্বতী দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ গম্ভীর, চোখের মণিতে তখনও আঁচ রয়েছে, চিবুক শক্ত।

হন হন করে পূর্ণেন্দু এগিয়ে এসে বলল, "এটা তুমি কি করলে?"

পার্বতী স্বামীর দিকে তাকাল না, কথাটা যেন তার কানেই যায় নি, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

পূর্ণেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার বলল, "তুমি এ-রকম একটা কাজ করবে আমি ভাবতেই পারি নি।"

পার্বতী স্বামীর মুখের দিকে লহমার জন্যে আড়চোখে তাকাল। "তোমার অনেক আগেই ভাবা উচিত ছিল।"

পূর্ণেন্দু যেন হাত বাড়াতে যাব-যাব করছিল, ধাক্কা খেয়ে হাত গুটিয়ে নিল, অথচ খুঁত খুঁত করতে লাগল। খানিক চুপ করে থেকে, বারকয়েক চোখের দৃষ্টি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে শেষে স্ত্রীর কঠিন মুখের দিকে চোরা চোখে তাকাল পূর্ণেন্দু। বলল, "যা করলে তারপর কি ওরা থাকবে?"

"আমি তো ওদের থাকতে বলি নি।" পার্বতী স্পষ্ট রূঢ় জবাব দিল।

পূর্ণেন্দু স্ত্রীর এই রূঢ়তা এবং রুক্ষতায় ক্ষুণ্ণ হল। "আমি ওদের ডেকে এনেছিলাম।"

"আমি বারণ করেছিলাম। তা সত্ত্বেও তুমি এনেছ।"

"ভুল করেছি। কিন্তু আমিই বা কি করে জানব ওরা এখানে এসে এই রকম করবে। কে ভাবতে পেরেছিল…"

পার্বতী স্বামীকে কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, "বেশ তো, তুমি ওদের নিয়ে থাকো, আমরা কলকাতায় ফিরে যাই।"

পূর্ণেন্দু এবার বিরক্ত হল। "তোমার কথার কোন মানে হয় না।…ওরা আমার কে? তোমারই আত্মীয়। কলকাতা থেকে ডেকে এনে এখন তাড়িয়ে দেওয়ায় তোমার গৌরব বাড়বে না।"

পার্বতীও তীব্র, তিক্ত চোখে স্বামীর দিকে তাকাল। "তুমি বার বার ও কথাটা বলো কেন। আমি ওদের নেমন্তন্ন করে এখানে

আনি নি। তুমি এনেছ। গৌরবই হোক আর নিন্দেই হোক সে তোমার প্রাপ্য আমার নয়।”

পূর্ণেন্দু যে কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। অল্প তফাতে বাড়ি দেখা যাচ্ছে, বারান্দায় কেউ নেই, সন্তু পেয়ারা গাছের ডালে বাঁধা দোলনায় বসে দোল খাচ্ছে। মনে মনে পূর্ণেন্দু একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিল : শশধরের ঘরে, শশধর দাড়ি কামাবার আয়োজন করে সাবান-মাখা সাদা গাল নিয়ে বসে আছে, বাসনা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে স্নানের জন্যে চুল খুলে আঁচড়ে নিচ্ছে। দুজনেই চুপচাপ, পার্বতীর রূঢ় স্পষ্ট কথাগুলো ওদের কানে বাজছে তখনও।

অসহায়ের মতন পূর্ণেন্দু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। তার বলার কিছু নেই; তবু শেষবারের মতন চেষ্টা করল, “মাথা ঠাণ্ডা করে তুমি একটু ভেবে দেখ। এভাবে কাউকে তাড়াতে নেই।”

পার্বতীর ধৈর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলল, “আমাকে আর জ্বালিও না, তোমার যা খুশি করো, ওদের আদর করে রাখতে চাও রাখো, আমাদের আর এই নোঙরামির মধ্যে রেখো না।”

পূর্ণেন্দু বুঝতে পারল, পার্বতীকে আর কোন মতেই নরম করা যাবে না। কালকের ঘটনার জন্যে সে মনে মনে লজ্জিত, বিব্রত, কিন্তু বাস্তবিকই তার জানা ছিল না শশধর এতটা বাড়াবাড়ি করবে। শশধরদের ওপর সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু পার্বতীর কাছে সে আরও কিছুটা সদয় ব্যবহার আশা করেছিল।

পূর্ণেন্দু বলল, “বেশ, আমি আর কিছু বলব না; তবে…”, বলতে গিয়েও পূর্ণেন্দু থেমে গেল, শেষে খানিকটা হতাশ গলায় বলল, “যাকগে, যা হবার হবে; আমার কপালটাই খারাপ।”

পার্বতী কোন রকম সাড়াশব্দ দিল না।

পূর্ণেন্দু গাছতলা ছেড়ে চলেই যাচ্ছিল, কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, “যাই বলো, তুমি ওদের ওপর এতটা চটা আগে আমি জানতে পারি নি, জানলে সঙ্গে নিয়ে আসতাম না।…ওরা যেমন বেশ বাড়াবাড়ি করেছে, তুমিও সেই রকম বাড়াবাড়ি করলে।”

পূর্ণেন্দু চলে গেল, পার্বতী একা দাঁড়িয়ে থাকল।

খানিকক্ষণ বিশেষ করে কিছু ভাবতে পারল না পার্বতী, বার বার তার শশধরদের কথা মনে পড়ছিল, যেভাবে ওদের ঘরে ঢুকে আচমকা দুজনকে কথা শুনিয়ে এসেছে, তাতে দুজনেই বোবা হয়ে গিয়েছিল। একটা কথাও বলে নি, বলার সাহস হয় নি। কথা বললে আরও তিক্ত অবস্থা হত।

এলা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়েছে, হাতে কাচা কাপড়, রোদে এসে ঘাস এবং গাছের নীচু ডালে কাপড়জামা মেলে দিচ্ছিল। দিদিকে সে দেখল, তারপর কাপড়চোপড় মেলা হয়ে গেলে বারান্দায় উঠে ঘরের দিকে চলে গেল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পার্বতীর হঠাৎ মনে হল, মহীপতি আসছে, কাছাকাছি কোথাও মোটর বাইকের শব্দের মতন শোনা যাচ্ছিল। তাকাল পার্বতী; গাছ, ঝোপ, উঁচু পাঁচিলের জন্যে দূরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। শব্দটা রেলক্রসিং পেরিয়ে এসেছে বলেই মনে হল, ওদিকে লাইনের ওপারের রাস্তায় রাশীকৃত ধুলো উড়ছে। পার্বতীর মনে হল, তার ভুল হয়েছে, ধুলো উড়িয়ে কোন গাড়ি যাচ্ছিল, সে ভুল শুনেছে। মহীপতি আসছে না। তার এখন আসার কোন কারণ নেই।

আর আচমকা পার্বতীর মনে হল, মহীপতির সঙ্গে দেখা হবার পর কি সে বেশি রুক্ষ হয়ে পড়েছে?

পার্বতী ঠিক বুঝল না, এবং স্বীকার করল না।

॥ চার ॥

সকাল থেকেই একটা গুমোট ভাব জমেছিল বাড়িতে। বেলায় আরও বাড়ল। দুপুর থেকে কী রকম এক আড়ষ্টতা। অতগুলো লোক বাড়িতে তবু যেন গলার শব্দ নেই। সন্তুর যা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, নয়ত সব চুপচাপ, অভ্যাসবশে সংসার চলছে এই যা, মানুষগুলোর সঙ্গে তার বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। কাল একরকম মনে হয়েছিল ; মনে হয়েছিল—এই যে একটা দল কলকাতা থেকে ছুটি কাটাতে ছুটে এসেছে, এরা খুব জীবন্ত, স্ফূর্তিবাজ, হুজুগে ; এদের পারিবারিক সম্পর্ক তৃপ্তিদায়ক। আজ একেবারে আলাদা রকম মনে হচ্ছে এদের ; মনে হচ্ছে, এরা সকলেই পৃথক, বিচ্ছিন্ন, একত্রে থাকলেও একের সঙ্গে অন্যের যোগ কিছু নেই ; যা আছে তা নিতান্তই চাক্ষুষ।

বিশ্রী রকম আড়ষ্টতা আর নিষ্প্রাণ এক আবহাওয়ার মধ্যে দুপুর গড়িয়ে গেল। রবি সারা দুপুর এলেরী কুইন্‌ পড়ে কাটাল, বা চোখ বুজে শুয়ে থাকল ; পূর্ণেন্দু বাসি খবরের কাগজ পড়ে আর ঘুমিয়ে দুপুর পার করল। পার্বতীর ঘরে পার্বতী চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল, এলা সিনেমার কাগজ দেখল খানিক, খানিক বা ঘুমোলো, জানলা দিয়ে দুপুরের আকাশও দেখল শেষ দুপুরে। সন্তু আপন মনে খেলা করে করে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

শশধরদের ঘরের দরজা সকাল থেকেই প্রায় বন্ধ। কালকের মত্ততার পর আজ শশধর বা বাসনা কেউই তেমন সুস্থ নয়। বাসনা ক্লান্তি ও অবসাদে নিস্তেজ হয়ে আছে। কাল বোঝা যায় নি, আজ ওর দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়, তার শারীরিক আঘাতগুলো কম নয়, বাঁ চোখের তলায় কালশিটে পড়ে কালচে হয়ে গেছে, গলার কাছে নখের দাগ, ডান হাতের কনুই ফোলা। হাতের কাটা জায়গাটায় ক্ষত হয়ে আছে। পিঠ টান করে বসে থাকতেও কষ্ট

হচ্ছিল বাসনার। শশধরও ভাল নেই। তার গায়ে আঁচড়ানো-খামচানোব দাগগুলো ঢাকা, কানের পাশে অনেকটা জায়গা লাল হয়ে আছে। বাইবে থেকে কাল যতটা বোঝা গিয়েছিল ঘরের মধ্যে তাব চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র কাণ্ড ঘটেছে। নিজেদেব শরীর মনেব জ্বালাব ওপব পার্বতীব আজকের ব্যবহারে ওরা দুজনেই কেমন আহত, অপমানিত। এমনও হতে পারে, সকালের আলোর স্বাভাবিকতায় তারা কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। বিকেল পর্যন্ত শশধর আর ঘবের দবজা খুলল না।

বিকেল পডে আসাব সময় থেকেই অন্য দিন বেডাতে বেবোনোর উদ্যোগ শুরু হয়। আজ কোন উদ্যোগ নেই। চা খেয়ে যে যার মতন সময় কাটাতে লাগল। সন্তু ছটফট কবতে শুরু করেছিল, জামা-প্যাণ্ট পবে সে তৈবি, চুল আঁচড়েছে নিজে নিজে, তাবপর একবাব রবি অন্যবার এলাব কাছে ঘুবঘুব কবতে লাগল।

ববিবও ভাল লাগছিল না, তাব পক্ষে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বোবা হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত পার্বতীকে গিয়ে বলল, "কি, আজ ঘবে বসেই কাটাবে নাকি ?"

পার্বতী বলল, "তোমবা যাও, ঘুরে এস।"

"আমবা আবাব কে ! কাবও কোন রকম গা দেখছি না।"

"তুমিই তাহলে সন্তু আর এলাকে নিয়ে ঘুরে এস।"

"তুমি ?"

"আমার ভাল লাগছে না।"

"ঘবে বসে থাকলে আরও খাবাপ লাগবে। চলো, বেড়িয়ে আসি খানিকটা, ভাল লাগবে।"

পার্বতী মাথা নাড়ল। "না, তোমরা যাও। আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।"

রবি আরও খানিকটা অনুনয় বিনয় করল। শেষে মনে করিয়ে দিল, "আজ আমাদের মহীপতিবাবুর বাড়ি যাবার কথা। ভদ্রলোক অপেক্ষা করবেন।"

পার্বতী বলল, "তোমরা ঘুরে এস। আমি পরে যাব।"

অগত্যা এলাকে তৈরি হয়ে নিতে বলে রবি পোশাক পাল্টাতে গেল।

রবিরা যখন বেরুলো বিকেল তখন ফুরিয়ে গেছে, আকাশের তলায় তলায় মরা আলো ক্রমশই ফিকে হয়ে হয়ে ছায়ার রং ধরছে। পূর্ণেন্দু আরও একটু পরে পার্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল।

"একটা কথা ভাবছি," পূর্ণেন্দু বলল, "শশধরবাবুকে আমি না হয় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলি, কাছাকাছি একটা বাড়িতে গিয়ে থাকুক ওরা, দু-চারদিন পবে বরং কলকাতায় ফিবে যাবে।"

পার্বতী কোন কথা বলল না।

পূর্ণেন্দু আবাব বলল, "এভাবে তাড়িয়ে দেবার চেয়ে সেটা ভাল।"

পার্বতী বলল, "আমি কিছু জানি না। যা তোমার ভাল মনে হয় করো।"

পূর্ণেন্দু অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছিল, শশধরদের অন্য কোন বাড়িতে তুলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ বাড়িতে আর ওদের রাখা যাবে না। আর আজ বা কালই ওদের কলকাতার গাড়িতে তুলে দেওয়া ভীষণ দৃষ্টিকটু।

স্ত্রীকে বোঝাবার মতন করে পূর্ণেন্দু এবার বলল, "আমাদের মদনবাবুকে ধরলে একটা ছোট মতন বাড়ি কাছাকাছি পাওয়া যাবে নিশ্চয়। চেষ্টা করে দেখি, কি বলো?"

"দেখো," নিস্পৃহভাবে পার্বতী জবাব দিল।

"তার আগে শশধরবাবুদের বলে দেখি। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করাতে পারলে ভাল। তোমার কি মনে হয় ওরা অরাজী হবে?"

"কি করে বলব?"

"আমার মনে হয় রাজী হয়ে যেতে পারে। কালকের ব্যাপারের পর দুজনেই দমে গেছে।...এমনিতে যে শশধরবাবু লোক খারাপ তা নয়, তবে ওই—মোদো-মাতাল হয়ে পড়লে কোন সেন্স থাকে না।"

পার্বতীর ইচ্ছে হচ্ছিল, বাসনাদের সম্পর্কে কোন কোন কথা সে বলে। বলল না। পূর্ণেন্দুকে সে আগে যা বলেছে তাতে যখন কোন লাভ হয় নি, এখন বললে আর বড় লাভ হবে না। পূর্ণেন্দু একেবারে নিঃস্বার্থে ওদেব আনে নি বা আদর-আপ্যায়ন করছে না। শশধররা রাগ করে, অপমানিত হয়ে চলে গেলে ক্ষতি পূর্ণেন্দুব কম নয়।

পার্বতীকে আর ঘাঁটাল না পূর্ণেন্দু। সকালের চেয়ে স্ত্রীর মন মেজাজ খানিকটা যেন থিতোনো মনে হল, আগুনের ঝলসানো আঁচ কমে এলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। পূর্ণেন্দুব ভয় ছিল, পার্বতী হয়ত এ প্রস্তাবেও রাজী হবে না, আপত্তি করবে, বলবে—যার দায় সে খুঁজুক, তোমার মাথাব্যথা কেন?

পার্বতী কোন আপত্তি তুলল না, পূর্ণেন্দু এতেই যেন স্বস্তি পেল। এরপর শশধর আব বাসনা। তাদের রাজী কবাতে হবে। বলা যায় না, শশধব সম্মত হবে কিনা, তবু চেষ্টা করবে পূর্ণেন্দু।

পূর্ণেন্দু চলে গেল।

পার্বতী ঘরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, অন্ধকার হয়ে এসেছিল, হাতে করার মতন কোন কাজ নেই, বড় জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ ও গাছপালা দেখে গড়িয়ে পড়া সন্ধ্যার মধ্যে কখন যেন সে হারিয়ে গেল।

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে পার্বতী বেরিয়ে পড়েছিল। গায়ে সাধারণ হালকা রঙের শাড়ী, পায়ে নরম একটা চটি, বিকেলে চুল বেঁধে নিয়েছিল, এলো খোঁপা, গায়ের আঁচল টেনে হাঁটতে হাঁটতে পিচের রাস্তায় চলে এসেছিল। বাঁ দিকে ফুলডুংরি, ডান দিকে রেল-ক্রসিং, তারপর বাজার, বাজার দিয়ে চলে গেলে স্টেশন।

রেল-ক্রসিংয়ের ঢালু জমিটার কাছে এসে পার্বতীর খেয়াল হল, সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে খানিকটা। উদ্বেগের কিছু নেই। বাড়িতে ঠাকুর আছে, কলকাতার বাড়ির পুরোনো ঠাকুর। আসার সময় ঠাকুর তাকে দেখেছে। পূর্ণেন্দু বাড়িতে নেই। শশধরকে নিয়ে

বেরিয়ে গেছে। বাড়ি খুঁজতেই গেছে হয়ত। বাসনাকে পার্বতী দেখে নি। সে তার ঘরে রয়েছে না বেরিয়েছে পার্বতী জানে না।

রেল-ক্রসিংয়ের কাছে পার্বতী সামান্য দাঁড়াল। বাজারে আলো জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা গেল, দু-চারজন পথচারী, স্বামী-স্ত্রী এবং প্রবীণা একজন রাস্তা ধরে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছে, বেড়িয়ে ফিরছে হয়ত। এখন পথে বেরোলে অনেক লোক দেখা যায়, চেঞ্জারের দল, বুড়ো-বুড়ী থেকে বাচ্চা-কাচ্চা সবই দেখা যায়। পথ-ঘাট গুলজার করে কলকাতার সেই ছোড়াগুলোও ফেরে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলে, গান গায়। এখানে সবাই একটা মুক্ত মনের আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই আনন্দটুকুর জন্যেই আসা, নয়ত আসবে কেন, শুধু জল-বাতাসের জন্যে !

পার্বতীদের মধ্যেও এটা ছিল। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত বেশ ছিল। শশধরদের পছন্দ করুক না করুক কাল পর্যন্ত এমন কিছু ঘটে নি যাতে পার্বতীরা নিজেদেব এই আনন্দের অংশীদার মনে করে নি। তারপরই সব কি রকম হয়ে গেল আচমকা।

প্রায় গায়ের পাশ দিয়ে একটা সাইকেল চলে গেল। পার্বতী সরে দাঁড়াল। এখানকার সাইকেলগুলো এমন ভাবে যায় যেন ঘাড়ে এসে পড়বে। ততক্ষণে সেই স্বামী-স্ত্রী ও প্রবীণা মহিলা কাছে এসে গেছে। ওদের কথাবার্তা কানে আসছিল পার্বতীর। চুরি-চামারির কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। কোথায় যেন চুরি হয়ে গেছে—, পার্বতী এই রকম শুনল। প্রবীণা কি একটা কথা বললেন। পার্বতীকে একা এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনজনেই তাকাল, দাঁড়াবার মতন হাঁটার গতি মন্থর করল, চুপ করে গেল; তারপর আবার কথা বলতে বলতে চলে গেল।

চুরি-চামারির কথায় পার্বতী অন্যমনস্কভাবে বাড়ির কথা ভাবল। আসবার সময় সে ঘরের দরজা ভেজিয়ে এসেছে, তালা দেয় নি। পূর্ণেন্দুদের ঘরেও নিশ্চয়ই তালা দেওয়া নেই। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় পার্বতী কাছাকাছি, বাড়ির সামনে খানিক পায়চারি

করবে ভেবেই বেরিয়েছিল; দরজায় তালা দেবার কথা মনে হয় নি, অথচ সে খানিকটা পথ চলে এসেছে। বাড়িতে ঠাকুর রয়েছে; বিশ্বাসী, পুরোনো ঠাকুর। কিন্তু মুহূর্ত কয় আগে, পার্বতী ঠাকুরের ওপর যতটা আস্থা রাখতে পেরেছিল, এখন আর অতটা পারল না। তার মন খুঁতখুঁত করল। ঠাকুর রান্নাঘরে থাকবে, কাজে ব্যস্ত থাকবে, তার পক্ষে সামনের দিকের ঘরের ওপর নজর রাখা সম্ভব না।

ঘরে হাতিঘোড়া কিছু নেই। তবু দু-চারটে খুচরো সোনাদানা আছে, টাকাপয়সা সবই ট্রাঙ্কে, কাপড়চোপড়ও রয়েছে। কেউ যদি সামনে দিয়ে ঠাকুরের অজ্ঞাতে ঘরে ঢুকে কিছু নিয়ে যায় বলার কিছু নেই।

পার্বতী আর দাঁড়াল না, ফিরতে লাগল। চুরি-চামারিতে তার অতটা ভয় নেই; কিন্তু এখন তার অন্য রকম দ্বিধা এল। বাড়ি থেকে একটা সামান্য কিছুও যদি খোয়া যায় তবে ওরা বলবে, সে কী, দরজা খুলে তুমি বাইরে বেরিয়ে গেলে? সাধারণ একটা বুদ্ধিও তো তোমার থাকবে? এরকম বোকামি কেউ করে?

এভাবে চলে আসাটা বোকামি। পার্বতী এখন আর সচরাচর বোকামি করতে চায় না, বোকার মতন কাজকর্ম সে ভীষণ অপছন্দ করে; চোখের সামনে বোকামি দেখলে তার বিশ্রী রাগ হয়। দায়িত্বহীনতা আরও আতঙ্কের বিষয়। একসময় পার্বতী দুই-ই করেছে। চূড়ান্ত বোকামি করেছে, সেই সঙ্গে দায়িত্বহীনও হয়েছে।

পার্বতী সামান্য দ্রুতপায়ে হাঁটছিল। নিজের বোকামির জন্যে তার একটা স্থায়ী ক্ষোভ থেকে গেছে। সেই ক্ষোভ অবশ্য প্রত্যহ তাকে পীড়া দেয় না, সেটা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কারণে পীড়া দেয় বই কি। এই নিত্যদিনের সংসারে খেতে পরতে, স্বামী এবং ছেলেকে দেখতে শুনতে, ছোট বোনের দায় বইতে, এবং আরও দশরকম চাহিদা মেটাতে মেটাতে নিজের এত সময়, মনের এতখানি চলে যায় যে নিজের কোনো ক্ষোভ নিয়ে ভাববার সময় জোটে না। তাছাড়া, সব ক্ষতই শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়,

যদিও দাগ থাকে অনেক ক্ষেত্রে, এবং আজীবনেও সেটা মিলিয়ে যায় না। পার্বতী এমন বয়সে এই বোকামি করেছিল, সাধারণত যা বোকামির বয়েস নয়। তখন সে পরিপূর্ণ যুবতী নয়, অথচ তাকে নাবালিকা বা কিশোরীও বলা যায় না। এখন এলার যা বয়েস, বছর উনিশ-কুড়ি, তার চেয়েও বয়েস তার বেশি ছিল। বাইশ চলছিল তখন। মুশকিল এই যে, তখন যদি পার্বতী এমন কোনো আঘাত পেত যা ভীষণ বা মারাত্মক একটা ক্ষত সৃষ্টি করার মতন, যা আরোগ্য হয় না, দিনে দিনে শোষের মতন ছড়িয়ে যায়—তবে অন্য কথা ছিল। সেরকম ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে নি, আজ অন্তত পার্বতী তা বেশ বুঝতে পারে। প্রথমটায় তার লেগেছিল, কিছুদিন সে যন্ত্রণা ভোগ করেছে, ছটফট করেছে নিজে নিজে; তারপর যা হয়, ক্রমেই সেই জ্বালা যন্ত্রণা, ক্ষত সেরে এসেছে। পশুরা তাদের শরীরের ক্ষত জিভ দিয়ে চেটে চেটে আরোগ্য করে; মানুষ তার মনের ক্ষতও সান্ত্বনা দিয়ে আরোগ্য করে। উপায় কি! জীবন বলতে যা বোঝায় তা দু-চার মাস বা দু-এক বছরে কিছু নয়, তার পথ এত আঁকবাঁক ঘিরে, এত জলের পাশ দিয়ে, বছরের পর বছর ধরে চলে যে স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ বাঁচার জন্যে অনেক কিছু সামলে নেয়। পার্বতীর বেলায়ও দেখা গেল, পার্বতী সামলে ফেলেছে। বাঁচতে হবে তাকে, ছেলেমানুষি আর বোকামি করে যা ঘটিয়ে ফেলেছে তার এমন কিছু মূল্য বাস্তবিক নেই, ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মতন মূর্খতা আর সে করবে না।

বাড়ির কাছাকাছি, একেবারে নিজের এলাকার মধ্যে পৌঁছে পার্বতী হঠাৎ কাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ তুলে দেখল বাসনা। একেবারে সামনে।

কেমন আলুথালু বেশভূষা বাসনার, মাথার ফাঁপানো চুল ঘাড়ের কাছে দুলছে, শাড়ির আঁচল যেন মাটিতে লুটোচ্ছে। ওকে দেখলে মনে হচ্ছে, এই মাত্র বিছানা থেকে ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে। সারা মুখে ফোলা ভাব। শান্ত, অলস ভাবে বাসনা সামনে

পায়চারি করছিল।

পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই ভাল ছিল। পার্বতী পাশ কাটাতে গিয়েও পারল না। দাঁড়াল। বলল, "তুমি?"

ভারী মোটা গলায় বাসনা বলল, "বেড়াচ্ছিলাম।"

"ও।"

"সারাদিন শুয়ে থেকে থেকে আর ভাল লাগছিল না—, তাই···"

বাসনাদি যে বাড়িতে আছে পার্বতী খেয়াল করে নি; ভেবেছিল, শশধরদের সঙ্গে বেরিয়েছে। আগ্রহ থাকলে হয়ত পার্বতী শশধরদের ঘর লক্ষ্য করত, সে আগ্রহ তার ছিল না; তা ছাড়া দরজা ভেজিয়ে ঘরের মধ্যে কেউ বসে থাকলে পার্বতীই বা জানবে কি করে!

পার্বতী এবার পাশ কাটিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল, বাসনা কথা বলল। "কোথায় গিয়েছিলি তুই? বেড়াতে?"

"না।"

"ওরা কোথায়?"

"রবিরা বেড়াতে গিয়েছে," পার্বতী অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে জবাব দিল। 'ওরা' বলতে বাসনা কাদের বোঝাতে চাইছিল পার্বতী ধরতে পারল না, রবিদের না শশধরদের। শশধররা যে বাড়ির খোঁজে গেছে বাসনাদি কি জানে? জানে নিশ্চয়।

বাসনা অলস ভাবে মাথা দুলিয়ে, ছোট হাই তুলে জড়ানো গলায় শব্দ করল। তারপর বলল, "এরা গেছে বাড়ির চেষ্টায়—।"

পার্বতী নিরুত্তর থাকল।

"আমি বলেছিলাম—", বাসনা বলল, "চলে যেতে। এখানে মানুষ বেড়াতে আসে? শুধু নামেই ঘাটশিলা—! যাচ্ছেতাই···!"

বাসনার কথাবার্তা পার্বতী বড় বিশ্বাস করে না। তবু সে ভাবল, চলে যেতে চেয়েছিলে যখন চলে গেলেই পারতে। যাচ্ছ না কেন?

মুহূর্ত কয় চুপচাপ থাকার পর বাসনা বলল, "এমন জানলে আমিই কি এখানে আসি?"

পার্বতীর ভাল লাগছিল না। দাঁড়িয়ে থাকলেই কথা বলতে

হবে। ভাবভঙ্গিতে সে চলে যাবার উপক্রম করছিল। বাসনাই বা কি করে এত কাণ্ডের পর কথা বলছে নির্লজ্জের মতন সে বুঝতে পারছিল না।

বাসনা এবার বলল, "অত ছটফট করছিস কেন? কিসের কাজ তোর! দাঁড়া, ক'টা কথা বলব।"

পার্বতীকে বাধ্য হয়েই যেন স্থির হতে হল। "ঘরে আমার কাজ রয়েছে।"

"তোর কোনো কাজ নেই। তুই আমার সামনে থাকতে চাস না।"

"আমার কাজ আছে……", রুক্ষ ভাবে পার্বতী বলল।

"তুই যে যথেষ্ট কাজের মেয়ে আমি জানি।" বাসনা গা করল না, বরং হঠাৎ বলল, "আমাকে তোর ঘেন্না কিসের? মদ খেয়েছিলাম বলে? কি হয়েছে মদ খেয়েছি তো! খেতে ভাল লাগে খাই, মাঝে-মাঝেই খাই। কাল বেশি খেয়েছিলাম। বেশি খেলে সব জিনিসেই শরীর খারাপ হয়।" বাসনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল তার কথায় কি রকম এক অসংলগ্ন ভাব রয়েছে। "তুই আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘরদোর ধুইয়ে ফেলবি নাকি?"

এই শেষের দিকের কথার বিদ্রূপটা পার্বতীর ভাল লাগল না, বলল, "আগে যাও, তারপর দেখব কি করি।"

বাসনা বোধ হয় এই মুহূর্তে এ-রকম কঠিন জবাব প্রত্যাশা করে নি। পার্বতীকে দেখতে দেখতে বলল, "তুই আমায় ভাবিস কি! আমরা এসেছি, না তোরা যেচে এনেছিস? কেন এনেছিস? তোদের বুঝি গরজ নেই?…আমায় তুই খুব নোংরা মেয়েছেলে ভাবিস! তাতে আমার বয়েই গেছে। আমি বরাবরই নোংরা। তবে তুই কি এমন শুদ্ধ মেয়ে রে?"

পার্বতী পলকে চোখ তুলে বাসনার দিকে তাকাল। তার মাথা গরম হয়ে এসেছে আগে, এবার যেন ঝাঁজ লাগল। "তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলার সময় আমার নেই। তুমি নোংরা না পরিষ্কার আমি তা জানতে চাই নি, আমার বাড়িতে আমার সামনে এসব

চলবে না।"

পার্বতী চলে যাচ্ছিল, বাসনা তীক্ষ্ণ করে বলল, "তোর বাড়িতে আমাদের মাতামাতি ইতরামি না চলুক, তোর নিজের চলবে না?"

পার্বতী এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। পেছন ফিরে তাকাল। "কি বললে তুমি?"

"বলছি আমরা চলে গেলেই তুই বাঁচবি নাকি?"

"সে ভাবনা আমার।"

"শুধু তোর ভাবনা কেন, আরও কত···"

"বাসনাদি!"

"তুই আমায় ধমকাতে আসিস না। যখন নেশায় মরে ছিলাম তখন ধমকেছিস কিছু বলি নি। এখন আর ধমকাতে যাস না।··· ওই মহীপতি লোকটার জন্যে তোর এখন বড় ভয়। তুই আমাদের কেন তাড়াচ্ছিস আমি বুঝি না। তাড়াচ্ছিস নিজের গরজে। কি ভাবিস তুই? ··আমাকে তুই ওই লোকটাকে চিনিয়ে দিবি? যথেষ্ট চিনি ওকে। তোর বেশি চিনি।"

পার্বতী যেন পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

॥ পাঁচ ॥

"তুমি ওকে চেনো ?" পার্বতী সরাসরি প্রশ্ন করল।

মহীপতি স্থিরদৃষ্টিতে পার্বতীর চোখের বিহ্বলতা দেখতে দেখতে বলল, "চিনি।"

পার্বতী কিছুক্ষণ আর পলক ফেলতে পারল না। বিভ্রান্ত চোখে মহীপতির দিকে তাকিয়ে থাকল।

কুকুরটা বাইরে বাগানের দিকে বাঁধা আছে, চেঁচামেচি করছে না আর। বারান্দার গা ঘেঁষে ছোট মতন একটা ঘরে মহীপতিরা বসেছিল। জানলা খোলা, দরজাও খোলা। রোদের আলো আসছিল ঘরে, আর খানিকটা পরে রোদ এসে পড়বে জানলা দিয়ে। সন্তু আর এলা রবির সঙ্গে নদীর দিকে গেছে মাছ কিনতে। নদীর মাছ।

সকালের শুভ্রতার সঙ্গে হেমন্তের রোদ, শিশির, সুস্নিগ্ধ বাতাস এবং এই নির্জনতার ভাব মিশে গিয়ে মহীপতির বাড়ির চারপাশ খুব মনোরম হয়ে উঠেছিল। বনের দিকে উড়ে যাওয়া পাখিও মাঝে মাঝে ডাকছে। লতাপাতার কেমন এক মধুর গন্ধও যেন বাতাসে। ঘরের মধ্যে ভোমরা ঢুকে পড়ে উড়ছিল পাক খেয়ে, আবার জানলা দিয়ে বাইরে চলে গেছে কখন।

পার্বতী কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে সামলে নিতে। বলল, "ওকে তুমি চেনো—আমায় বলো নি তো ?"

মহীপতি বলল, "বলি নি, কারণ, উনি আমায় চিনতে চাইতেন না। দেখলাম তো, চিনেও না-চেনার ভান করছেন। উনি যখন চেনাতে চান না, আমি তখন গায়ে পড়ে কেন চিনি।"

পার্বতী ভাবল সামান্য। কাল সে অনেক ভেবেছে। ভেবে ভেবে তার মনে একটা খটকা জেগেছিল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ির বেড়িয়ে ফেরার পর যখন সামনে মহীপতিকে দেখতে পেয়ে সে বাসনাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তখন বাসনাদি কি রকম এড়িয়ে

যাওয়ার ভাব করেছিল। একটি দুটির বেশি কথা বলে নি। পরেও আর কথাবার্তা বলতে আসে নি। এই ব্যাপারটা যদিও পার্বতীর কাছে সামান্য দৃষ্টিকটু লেগেছিল, তবু সে বুঝে উঠতে পারে নি—বাসনাদি মহীপতিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এখন অবশ্য বোঝা যাচ্ছে, বাসনাদি ইচ্ছে করেই মেলামেশা বা আলাপে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু মহীপতি? মহীপতি তাকে বলে নি কেন কিছু?

পার্বতী বলল, "উনি চেনাতে চাইলেন না, আর তুমিও চিনলে না। বাঃ, বেশ তো!"

মহীপতি তখনও পার্বতীর মুখ দেখছে। অল্প হেসে বলল, "আমি চিনব না কেন, চিনেছিলাম। তোমায় বলি নি।"

"কেন?"

"বলেই বা কি হত!"

পার্বতী গম্ভীর হয়ে সামান্য সময় চুপ করে থাকল। শেষে বলল, "ও তাহলে ঠিকই বলেছে, তোমায় চেনে?"

"চেনে বই কি।"

"কি করে চিনল?" পার্বতী জেরা করার মতন শুধলো এবার।

মহীপতি কোনো জবাব দিল না। মনে মনে সে ভাবছিল, মুখে হালকা হাসি, যেন কথাটার গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

জবাবের আশায় পার্বতী মহীপতির দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছু বলছে না মহীপতি। এমন ভাবে হাসি-মুখ করে আছে যেন কথাটা কিছুই নয়। ধৈর্য থাকছিল না পার্বতীর। বিরক্ত হয়ে বলল, "কি হল, কথা বলছ না যে?"

মহীপতি মুচকি হাসল। "চেনা-শোনা হতে বাধাটা কোথায়?"

"বাধা থাক না-থাক, তোমার সঙ্গে চেনা হল কি করে?"

"তোমার কি খুব জানার ইচ্ছে?"

"আমি সাত সকালে তোমার সঙ্গে তামাশা করতে এসেছি ভাবছ?"

"না না, তামাশা করতে আসবে কেন—", মহীপতি হেসে বলল,

"তোমার আসার কথা ছিল, বলেছিলে আসবে। বেড়াতেও আসতে পার।···যাকগে, তোমার দিদির সঙ্গে আমার কি করে চেনা-শোনা হল এটা তুমি জানতে চাও। ব্যাপারটা কি খুবই জরুরী?"

"হ্যাঁ," পার্বতী গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ল।

"ওঁকে আমি নানা ভাবে চিনি। সেদিন তোমাদের মধ্যে ওঁকে দেখে আমি অবাকই হয়েছিলাম। তখন কিছু বলি নি। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখাও হয় নি। দেখা-সাক্ষাৎ হলে হয়ত বলতাম।"

"নানাভাবে চিনি মানে?" পার্বতীর কোথাও খটকা লেগেছিল।

মহীপতি বলল, "প্রতিবেশী হিসেবে একভাবে চিনি। একসময় উনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন।"

"কখন?"

"আমি তখন ল্যান্সডাউনে থাকতাম।"

"ও!···আর কিভাবে চেনা?"

"আরও চিনি, কিন্তু তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমি তো ওঁকে বিলক্ষণ চেনো, তোমার আত্মীয়।"

পার্বতী এবার যেন নিজের কোথাও খানিকটা দ্বিধা অনুভব করল। মহীপতির কাছে তার এভাবে ছুটে আসার একটা অর্থ নিশ্চয় ধরা পড়ে যাচ্ছে। মহীপতি যতভাবেই চিনুক সেই চেনার কিছু কি পার্বতী বুঝতে পারছে না? তবু কৌতূহল হয়। কৌতূহলেরও যা বেশি, যার জন্যে পার্বতী এই সকালে মহীপতির বাড়িতে হাজির হয়েছে তা অন্য কিছু। ভয় কি? পার্বতী ভয় পাচ্ছে?

নিজের মনের উতলা ভাব পার্বতী চাপা দিয়ে রাখল। বলল, "ও আমার সম্পর্কে দিদি হয়, কিন্তু আগে আসা-যাওয়া ছিল না, ওই কখনো-সখনো কোনো পারিবারিক কাজে যদি হঠাৎ দেখা হয়েছে। আমি ভাল করে চিনতামই না। বাবা-মা যতদিন ছিলেন এক-আধবার দেখেছি। তারপর কোনো সম্পর্কই ছিল না। এই হালে আবার আমার কর্তার সঙ্গে ওদের ভাবসাব।"

মহীপতি খানিকটা বুঝল, ঠাট্টা করে বলল, "আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা হয়েছে।"

পার্বতী মাথা নাড়ল। "না। আমার সঙ্গে নয়।"

মহীপতি অনেকক্ষণ থেকেই নানারকম সন্দেহ ও অনুমান করছিল, এবার বলল, "ওঁকে নিয়ে তোমার রাতারাতি দুর্ভাবনা শুরু হয়ে গেল কেন?"

পার্বতী সরাসরি এই প্রশ্নটা পছন্দ করল না। অথচ সে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এগিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। তার ব্যবহার থেকে মহীপতি কিছু কি আঁচ করতে না পারছে? সাদামাটা জবাব দিয়ে মহীপতির কৌতূহল মেটানো যেতে পারে কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তাছাড়া, পার্বতী বাসনার ওপর এখন শুধু বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ নয়, কোথায় যেন তীব্র এক ঘৃণা অনুভব করছে।

পার্বতী বলল, "ওদের কাণ্ডকারখানা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।"

সামান্য চুপ করে থেকে শেষে পার্বতী সেদিনের রাত্রের ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করল, তারপর গতকালের কথা।

মহীপতি সব শুনল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না সে কতটা অবাক হয়েছে। হয়ত অনেক কিছু তাকে অবাক করলেও সবটাই অবাক হবার মতন নয়। চুপচাপ সমস্ত শুনে মহীপতি খানিকটা সময় নীরব থাকল, তারপর বলল, "ব্যাপারটা খুবই খারাপ, তোমায় বড় মুশকিলে ফেলেছে দেখছি।"

"আমি ওদের অন্য জায়গা খুঁজে নিতে বলেছি," পার্বতী রাগের সঙ্গে বলল।

"ভালই করেছ। তবে—"

"তবে-টবে নয়, ওরকম নোংরামি আমার বাড়িতে হতে দেব না। বোঝো তো, এলা কি ভাবল? সন্তু জেগে থাকলে আরও যে কি হত আমি ভেবে পাই না।"

মহীপতি মাথা নাড়ল আস্তে, "ঠিকই।"

পার্বতী অল্পক্ষণ আর কথা বলল না, শেষে শুধলো, "তুমি বললে

ওকে তুমি নানাভাবে চেনো। এক পাড়ায় থাকতে শুনলাম, আর কিভাবে চেনো?"

এবার মহীপতি কথাটা এড়িয়ে যাবার মতন করে মৃদু হাসল। "সে-সব শুনে তোমার লাভ নেই। কি হবে! আজ যা দেখছ ওঁকে, এরই নানারকম লক্ষণ দেখেছি।''

পার্বতী এ-রকম জবাবে খুশী নয়; অপ্রসন্ন ভাবে বলল, "বলতে তোমার আপত্তি কি?"

"না আপত্তির কিছু নেই; তবে অকারণে বলা। তোমারই বা শুনে কি হবে।"

পার্বতী ভাবল সামান্য, বলল, "তোমার সঙ্গে খুব মেলামেশা করেছিল নাকি?"

মহীপতি হেসে জবাব দিল, "খুব নয়, কিছুটা।"

"ও!" পার্বতী অন্যমনস্ক হল। দেখতে দেখতে জানলা দিয়ে রোদ ঘরে ঢুকলো। পেছনের দিকে কুয়াতলায় জল তুলছিল কেউ, শব্দ আসছে চাকার।

কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে পার্বতী হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠে সোজা হয়ে বসল। "এবার উঠি। ওরা যে কোথায় মাছ কিনতে গেল, কে জানে!"

মহীপতি বলল, "এখুনি উঠবে কি, বসো, চা-টা খাও। ওরা আসুক।" বলে মহীপতি যেন চায়ের তাগাদা দিতেই উঠছিল। তার আগেই পার্বতী উঠে দাঁড়াল।

"চলো তোমার ঘর-দোর দেখি—", পার্বতী বলল।

"এসো।"

পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে এল মহীপতি। ছোটখাটো বাড়ি, খোলামেলা ঘর, ভেতরের টানা বারান্দার নীচে বাঁধানো উঠোন, ওপাশে কুয়াতলা, কুয়াতলার গায়ে সবজি বাগান, মাঝবয়সী এক মালী কাজ করছিল, সামনে তাকালে পাঁচিল, পাঁচিলের ওপারে ঝোপঝাড় আর ঢালু জমি ঢেউ খেলিয়ে ছুটে গেছে, অনেকটা দূরে

মাঠের আলের মতন এক উঁচু বালিয়াড়ি পুব-পশ্চিমে ছড়িয়ে আছে, সবুজ দেখায়, ওপারে নদী, নদী দেখা যায় না, নদীর ওপারে বনজঙ্গলের ঝাপসা ছবি আর রোদভরা আকাশ।

দেখতে দেখতে পার্বতী বলল, "বাঃ, বেশ জায়গাটি তোমার।"

"শীতে আরও সুন্দর লাগে।"

"এখনও বেশ, চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা যায়।"

পার্বতী সামান্য দাঁড়িয়ে বারান্দার দক্ষিণে গেল। আরও একটা ঘর। ঘরের আধ-ভেজানো দরজা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল।

পার্বতী অবাক হয়ে বলল, "এই ঘরটা— ?"

মহীপতি বলল, "ওটা যার, সে বোধ হয় দরজা ফাঁক করে তোমায় দেখছিল, সাড়া পেয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে।"

"কে ও ?"

"দেখবে ?" মহীপতি দরজার কাছে এসে ডাকল, "রমা, বাইরে এস।"

ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজা বন্ধ। পার্বতী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

আরও দু-একবার ডাকল মহীপতি। শেষে দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। মহীপতি ভেতরে ঢুকে গেল।

মুহূর্ত কয় পরে হাত ধরে টানতে টানতে যাকে নিয়ে এল মহীপতি, পার্বতী তার দিকে তাকিয়ে নিষ্পলক হল। মাথায় লম্বা একটি মেয়ে, না শীর্ণ না ক্ষীণ, ছিপছিপ করছে চেহারা, গায়ের রঙ পাকা ধানের মতন, মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা চুলের গোছা, কাজললতার মত টানা টানা চোখ, দীর্ঘ নাক, আঁটো থুতনি, চিবুক লম্বা। সস্তা একটা ডুরে শাড়ি পরনে, পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড়। গায়ের জামাটা ছিটের। দু-হাতে দুটি রুলির মতন বালা।

রমা মহীপতির হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। মহীপতি ছাড়ছিল না।

পার্বতী কোনো রকমে যেন ঢোঁক গিলল।

মহীপতি পার্বতীকে বলল, "তোমায় দেখে লজ্জা পেয়েছে। ওর খুব লজ্জা। ভাল করে কথা বলতে পারে না। কিসের একটা গোলমাল আছে।"

আচমকাই রমা কিভাবে যেন হাত ছাড়িয়ে ঘরের মধ্যে ছুটে পালাল। পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

মহীপতি যেন কৌতুক অনুভব করে হাসতে লাগল।

ঘরে এল পার্বতী। মহীপতির শোবার ঘর। বিছানাটা দেখল। বলল, "ও তোমার কে? বউ?"

"না।"

"তবে?"

"আমার কাছেই থাকে—"

"দেখছি তা। কিন্তু ও কে?"

"কে যে বলা মুশকিল; যা ভাব—! সঙ্গিনী।"

পার্বতী মহীপতির হালকা মুখভাব লক্ষ্য করছিল, যেন ওই মেয়েটি থাকায় মহীপতির কোনো চিন্তা নেই। পার্বতী কি ভেবে বলল, "ওর বয়েস তো বেশি নয়?"

"না, বেশি কোথায়? বছর কুড়ি-টুড়ি হবে।"

"এই ভাবে তোমার কাছে রেখেছ? কেউ নেই ওর?"

"না কেউ নেই। ওর বাবা ওকে আমার জিম্মায় রেখে স্বর্গে চলে গেছে। সে আজ বছর সাত-আট হবে। তখন ও ভীষণ দুরন্ত ছিল। এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছে।"

পার্বতী শোবার ঘর থেকে বাইরে বারান্দায় এল। সামনে বাগান, ফটক বন্ধ, কুকুরটা বোধ হয় আলস্যে গাছতলায় বাঁধা অবস্থায় ঘুমোচ্ছে।

"বসো," মহীপতি একটা বসার জায়গা এগিয়ে দিল।

পার্বতী বসল। বলল, "তুমি সেদিন আমায় কিছু বললে না কেন?"

মহীপতি এবার হেসে ফেলল, বলল, "আমি যা বলেছি তার চেয়ে

বেশি বলার কি আছে। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে, বিয়ে-থা সংসারে করছি কিনা। বলেছিলাম, সংসার করছি, বিয়ে করেছি কিনা বাড়ি এসে দেখে যেও।”

পার্বতী যেন কি রকম বিব্রত বোধ করছিল। বাগানের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে উদাস গলায় বলল, “বাড়ি এসেও কিছু বুঝলাম না।”

“কেন, সংসার করছি যে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। বিয়েটাও আধাআধি।”

পার্বতী হঠাৎ মুখ তুলে বলল, “তুমি চিরটাকালই আধাআধি বিয়ে করার মানুষ।”

মহীপতি এবার আর জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ কি রকম চুপচাপ। বাগানে কাঠবেড়ালি ছুটছে, একটা দমকা হাওয়া এসেছে, জবাফুলের গাছ টকটকে লাল, তার মাথায় উজ্জ্বল রোদ।

ফটকের ওদিকে খানিকটা তফাতে রবিদের দেখা গেল। রবিরা আসছে।

মহীপতি দেখতে পেল ওদের। “ওই যে, ওরা আসছে। মাছ পেয়েছে যেন।”

পার্বতী তাকিয়ে থাকল।

“এবার চা আনতে বলি,” মহীপতি চলে যাচ্ছিল।

পার্বতী সহসা বলল, “একটা কথা বলছিলাম।”

দাঁড়াল মহীপতি।

পার্বতী অস্বস্তির মধ্যে বলল, “আমরা যে একবার লুকিয়ে বিয়ে করেছিলাম, এটা কি ও জানে?”

“কে, তোমার দিদি?”

পার্বতী মাথা দোলাল, হ্যাঁ, বাসনা জানে কি না।

মহীপতি বলল, “আমার তরফে যে সাক্ষী ছিল সে তোমার দিদির খুব চেনা-জানা। তার বেশি আমি জানি না।”

॥ ছয় ॥

কয়েকটা দিন কাটল। শশধররা গিয়েছে টাটানগর। সামান্য খোঁজাখুঁজি করে শশধরদের জন্যে একটা বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল, এ বাড়ির কাছাকাছিই হত, খাবারদাবার পাঠাতে ও অন্যান্য প্রয়োজনে আসা যাওয়া করতে অসুবিধা হত না,তবু শেষ পর্যন্ত ওরা টাটানগরেই চলে গেল। বেড়িয়ে আসার নাম করেই যদিও গিয়েছে, তবু দিন কয়েক থাকবে, তারপর এখানে ফিরে এসে সোজা কলকাতা। টাটানগরে যাবার ঝোঁকটা বাসনার। সেখানে তার জানা-শোনা লোক আছে। তা ছাড়া হোটেল-টোটেলও রয়েছে।

ব্যবস্থাটা মোটামুটি সকলেরই মনোমত হয়েছে বলা যায়। একসঙ্গে এসে হঠাৎ ভাগাভাগি হয়ে দু-বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ার চেয়ে এ ভাল, অন্তত দৃষ্টিকটু ভাবটা যেন ঢাকা পড়ে। পূর্ণেন্দু চক্ষু-লজ্জাবশত শশধরদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, যাতে মনে হয় দু-তরফের বিরোধ ও মনান্তরটা বাস্তবিক কিছু নয়। কিন্তু তার যাওয়া হয় নি, পার্বতীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটত কি ঘটত না সেটা অন্য প্রশ্ন, শশধরই রাজী হয় নি। খুবই আশ্চর্য, টাটানগর যাবার সময় শশধর পার্বতীর সঙ্গে এমন সাদাসিধে মনখোলা ব্যবহার করল যে মনে হল, পার্বতীর ওপর তার কোনো বিদ্বেষ বা রাগ নেই, সে ক্ষুব্ধ নয়, বরং যা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না এ বাড়িতে। শশধর খানিকটা লজ্জিত হয়ে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছিল।

শশধররা বেড়াতে যাবার মতন করেই গেল, জিনিসপত্র ফেলে গেল কিছু, যেন টাটানগরে দু-চারদিন কাটিয়ে চলে আসছে, তারপর সোজা কলকাতা ফিরবে। ওরা চলে যাওয়ায় বাড়িটা সামান্য ফাঁকা হল। বাসনার গলা ছিল জোরালো, উঠতে বসতে ডাকাডাকি করত; শশধরের ছিল মজলিশী স্বভাব, কদিনের মধ্যে এই বাড়িতে যে সরগরম ভাব হয়েছিল, ওদের অবর্তমানে তা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে

গেল। এখন নিরিবিলি ভাবটা আরও অনুভব করা যায় ; রাত্রের দিকে তাস বসে না, ফলে খুব শান্ত হয়ে যায় বাড়িটা। পূর্ণেন্দুরা আগের মতনই সকাল-বিকেল বাজারহাট ক'রে, বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে বটে তবে সময় ফুরোতে পারছে না। গল্পের বই পড়ে, কাগজ দেখে, পেসেন্স খেলে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলে কত আর সময় খরচ করা যায়। ক্রমশই একটা ঝিমুনি আসছিল বাড়িতে।

পার্বতী আর পূর্ণেন্দুর মধ্যে খুব চাপা একটা ক্ষোভ-বিক্ষোভ যে জমে উঠেছে এটা এখন মাঝে মাঝে বোঝা যায়। পার্বতী যেজন্যে ক্ষুব্ধ, পূর্ণেন্দু তা বাড়াবাড়ি মনে করে ; পূর্ণেন্দু যে কারণে বিক্ষুব্ধ পার্বতী তা অন্যায় মনে করে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এই মানসিক ক্ষোভ-বিক্ষোভের অবশ্য গুরুতর কোনো কারণ ছিল না, সময়ে মিটে যেতে পারত। কিন্তু পার্বতীর তরফে অন্য রকম এক পরিবর্তন এসেছিল। সেটা বোঝা যেত, এবং কারণটা যা অনুমান করা যেত—শশধর-বাসনার প্রতি বিরক্তি, স্বামীর প্রতি ক্ষোভ—তা নয়। পার্বতী অন্য চিন্তার ব্যাধিতে জড়িয়ে পড়ছিল।

পার্বতীর চরিত্র কিছুটা অদ্ভুত। তার একটা চেহারা ছিল যা বাইরের, তাকালেই চোখে পড়ে। ওর সহাস্য, সুন্দর ব্যবহার, পরিহাস-প্রিয়তা, মমতা, আন্তরিকতা—এ-সব চোখে না পড়ে যেত না। অন্তত এযাবৎ যারা তার কাছাকাছি এসেছে বা আশেপাশে থেকেছে তারা পার্বতীর বাইরের চেহারাটাকেই সাধারণত দেখেছে এবং আকর্ষণ বোধ করেছে। ওর ভেতরের স্বভাব কেমন, তা জানার সুযোগ বড় কারও হয় নি। অনেক সময়ে পার্বতী যে রূঢ়তা, কাঠিন্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ করত, সেটা তার চরিত্রের অংশ বলে ঘনিষ্ঠরা জানলেও এসব তার সাংসারিক স্বভাব, রাসভারী ব্যক্তিত্বের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছিল। পার্বতীর আরও ভেতরের একটা স্বভাব ছিল, বাক্সর একেবারে তলায় আড়াল করে রাখা নিজস্ব কিছু জিনিসের মতন। এখানে পার্বতীর হিসেবীপনা ছিল, উগ্র জেদ ছিল, এক ধরনের বেপরোয়াপনা ছিল। ক্ষোভ, তিক্ততা, নিষ্ঠুরতাও থেকে

গিয়েছিল। সে যে কী পরিমাণ সর্বগ্রাসী অধিকারবোধে আচ্ছন্ন ছিল পার্বতী নিজেও জানত না, তার হিংস্রতার কথাও অনুভব করত না।

ঘাটশিলায় এসে মহীপতির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার পর পার্বতী বিচলিত হয় নি। বরং এতকাল পরে মহীপতিকে পেয়ে সে তার পুরোনো কিছু ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা, প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার আচরণ থেকে এটা বোঝা যেত না, কারণ ঘটনাটা অনেক পুরোনো ; ঘায়ের ওপর চামড়া পড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতন ক্ষত ; লুকোনো, প্রায়-বিস্মৃত এই ক্ষত নিয়ে ছটফট করে বেড়াবে এমন স্বভাব তার নয়, সেটা স্বাভাবিকও নয়। কাজে-কাজেই পার্বতী রুক্ষ, উগ্র, হিংস্র হয় নি। সে কখনো-সখনো মহীপতিকে বিদ্রূপ করেছে, পরিহাস করেছে, আঘাত করেছে সূক্ষ্মভাবে। অর্থাৎ এ যেন অনেকটা শুকনো ক্ষতের মরা চামড়া টেনে তুলে আরাম পাওয়ার মতন। পার্বতী সেটুকু আরাম হয়ত পাচ্ছিল।

অথচ শশধর-বাসনার ঘটনার পর পার্বতী কি রকম সচেতন হয়ে পড়ল। হঠাৎ তার স্বভাবের খানিকটা পালটে গেল, অন্তত চোখ পড়তে লাগল। তার বরাবরের হাসিমুখ, সদালাপ, পরিহাস-প্রিয়তা, মমত্ব কেমন চাপা পড়ে গম্ভীর, বিরক্ত, অখুশী, রূঢ় ভাবটা যখন-তখন ফুটতে লাগল। পূর্ণেন্দু বা রবি এটা শশধর-বাসনার ঘটনার জের হিসাবে ধরে নিয়েছিল। পূর্ণেন্দু আরও ভেবেছিল, তার সঙ্গে পার্বতীর চাপা মনোমালিন্য ও ক্ষোভ-বিক্ষোভের জন্যে স্ত্রী অত গম্ভীর, উদাসীন, বিরক্ত। অথচ তা ঠিক নয়।

পার্বতীর মনে অন্য ভাবনা জড় হয়ে উঠেছিল। সে খানিকটা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। তার এখন সন্দেহ ও ভয় জাগছিল। অসহায় বোধ করতে শুরু করেছিল। এবং আরও কোনো কোনো ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিল।

সেদিন বিকেলে সামান্য ঘটনা নিয়ে পূর্ণেন্দুর সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে গেল পার্বতীর।

পূর্ণেন্দু বলল, "আমি বরাবর দেখেছি, তোমার মন জুগিয়ে চলাটাই তুমি বড় মনে করো।"

জবাবে পার্বতী বলল, "আর আমি বুঝি তোমাদের মন ভাঙিয়ে চলি?"

"আশ্চর্য স্বভাব তোমার—!" পূর্ণেন্দু রাগ করে বলল, "এটা কি রকম রীতি, সংসারে সবাই তোমার হুকুমের চাকর হবে!"

পার্বতীও মাথা গরম করে ববল, "আমাকেই বা তোমার চাকরানী হতে হবে নাকি?"

"তোমায় আমি চাকরানী করে রাখি নি।"

"না, রাজরানী করে রেখেছ।"

"তোমার হয়ত সে-রকম শখ ছিল; বিয়ের সময় রাজাটাজা খুঁজে নিলেই পারতে। আমার যে রাজত্ব নেই এটা ভাল করেই জানতে তুমি।"

"তোমার কিছুই নেই। রাজত্ব চুলোয় যাক, বাপের দৌলতে পাওয়া বাড়িটাও কি আছে তোমার আর! মর্টগেজ রেখে বসে আছ।"

পূর্ণেন্দু আত্মসংযম হারাল। "বেশ করেছি, আমার বাড়ি আমি যা খুশি করব।"

"করছই তো, আবার করব কি! তুমি কি ভাব, তোমার বাড়ির জন্যে আমি মরে যাচ্ছি? তোমার বাড়ি না হলেও আমার দিন কেটে যাবে।"

"তা যাবে, কিন্তু যতদিন না যাচ্ছে ততদিন মেজাজ করো না।" পূর্ণেন্দু ঘর ছেড়ে চলে গেল। পার্বতী অপমানের জ্বালা মেখে দাঁড়িয়ে থাকল।

অথচ ব্যাপারটা কত তুচ্ছ, সামান্যমাত্র। পূর্ণেন্দু এসে বলেছিল, সারা দুপুর ছেলেটাকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে নিজে শুয়ে শুয়ে আরাম করছ। যাও দেখো না—হাঁটু ছড়ে পা কেটে বসে আছে। তোমার বোনও তো নভেল মুখে বসে। ওয়ার্থলেস সব।

অন্য সময় হলে পার্বতী সন্তুকে মাঠে চরার স্বাধীনতা দিত না, বা সন্তু কোনো ফাঁকে পালিয়ে গিয়ে হাঁটু ছড়িয়ে পা কেটে এলে পূর্ণেন্দুকে অত কথা বলার সুযোগই দিত না, এলাও বই মুখে বসে থাকার অবাধ অবকাশ পেত না ; কিন্তু এখন পার্বতী কেমন যেন হয়ে গেছে, সব রাশ ছেড়ে দিয়েছে, উদাসীন হয়ে পড়েছে, গরজ নেই, গা নেই ; যে যা করছে করুক, যার যা খুশি করে নিক। এই নিস্পৃহতা তাকে অন্য সকলের থেকে পৃথক করে ফেলছিল।

পার্বতী অনায়াসে উঠে সন্তুকে দেখতে যেতে পারত। সেটাই তার রীতি। ছেলেকে বকত, হাঁটু-পায়ের যত্ন করতে বসত, পূর্ণেন্দুকে ভর্ৎসনা করত, এলাকে তিরস্কার করত। এখন পার্বতী কিছু করল না, কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না, বরং স্বামীকে বলল, ছেলে তোমার, তুমি তার খবরদারি করগে যাও, আমি শুয়ে ঘুমিয়েই থাকব।

এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে কলহটা বেধেছিল ; তারপর কথায় কথায় অনেকখানি গড়িয়ে গিয়ে 'রাজরানী'তে ঠেকেছিল। আজকাল মাঝে-মধ্যেই এরকম ঝগড়া বাধছে স্বামী-স্ত্রীতে।

ঘটনাটা ঘটেছিল বিকেলের গোড়ায়, তারপর বাড়ির মধ্যে কেমন একটা ছাড়া ছাড়া থমথমে ভাব এল, পূর্ণেন্দু রাগ করে একা-একাই কোথায় বেরিয়ে গেছে, রবি গিয়েছে তার সদ্যপরিচিত একজনের বাড়ি বেড়াতে, সন্তু শেষ পর্যন্ত মার কাছে চড়চাপড় খেয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে ঘরে বসে আছে, পায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। এলাকে তার কাছে বসে লুডো খেলতে হচ্ছে।

পার্বতী কি মনে করে শশধরদের ঘরে গিয়ে বসেছিল। শশধরদের ঘর প্রায় ফাঁকা। ফেলে যাওয়া একটা ট্রাংক, বেতের ঝুড়ি, খুচরো ক'টা জিনিস ছাড়া কিছু নেই। চওড়া একটা তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি বিছানো ছিল। এটা অবশ্য শশধরদের নয়, পার্বতীদের, রবি পেতে রেখেছিল, পেসেন্স খেলত সময়বিশেষে। নিরিবিলি একা থাকার জন্যেই হয়ত পার্বতী এই ঘরে এসে বসেছিল।

তার খেয়াল ছিল না, মহীপতি এসেছে কখন, বাইরে এসে ডাকছিল।

এলা এসে বলল, "দিদি, মহীপতিদা এসেছে।"

পার্বতীর খেয়াল হল, বোনের দিকে তাকাল।

এলা বলল, "এখানে নিয়ে আসব ?"

পার্বতী কিছু না ভেবেই বলল, "আয় নিয়ে।"

মহীপতি এল। এলার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এসেছিল, ওরা কোন্ পাহাড়ে বেড়াতে যাবে, ঝরনা দেখবে—ধারাগিরি না কোথায়—তার জন্যে গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা করতে বলেছিল মহীপতিকে, মহীপতি সেই ব্যবস্থা করে এসেছে। পরশুদিন যাওয়া হবে।

এলা চলে গেলে মহীপতি পার্বতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "কি ব্যাপার, তুমি একলা এখানে বসে ? তোমার বাড়ির লোকজন কই ?"

শশধররা চলে গেছে মহীপতি জানত, পার্বতী বলল, "গেছে কোথাও ঘুরতে।"

"তুমি একলা ?"

"এলা সন্তু রয়েছে।···বসো।"

মহীপতি তক্তপোশের একপাশে বসল। পার্বতীর চোখমুখ গম্ভীর, অন্যমনস্ক, বিমর্ষ ও মলিন দেখাচ্ছিল। মহীপতি সরল ভাবে বলল, "তোমার এ-রকম চেহারা কেন ?"

পার্বতী জবাব দিল না। চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। ঘরে আলো জ্বলছিল, বাতিটা তেমন উজ্জ্বল নয়।

মহীপতি বসে থেকে একটা সিগারেট ধরাল। "পরশু তোমাদের ধারাগিরি যাবার ব্যবস্থা করলাম। যাও বেড়িয়ে এস। চমৎকার জায়গা। তবে শুনছি এখন নাকি একটু ভয় আছে। সঙ্গে ভাল লোক দিয়ে দেব, তেমন বুঝলে বেজায়গায় যেতে দেবে না।"

পার্বতী উদাসভাবে বলল, "ওরা যাক, আমি যাব না।"

"যাবে না ? কেন ?"

"ভাল লাগে না।"

মহীপতি লক্ষ্য করে পার্বতীর চোখের নিস্পৃহ উদাসীন ভাবটা দেখল। ক'দিন ধরেই মহীপতি এটা লক্ষ্য করছে। প্রথম দিনের সেই সজীব, সপ্রতিভ, সানন্দ ভাবটা যেন পার্বতীর হঠাৎ কেমন মরে গেছে।

মহীপতি চুপচাপ সিগারেট খেতে লাগল। শেষে বলল, "তোমার কি যেন একটা হয়েছে। কি?"

পার্বতী মহীপতির দিকে দুদণ্ড তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। সামান্য পরে বলল, "কিছু না। সংসারের রকম দেখছি···।"

"কি রকম দেখছ?" মহীপতি ঠাট্টা করে বলল, হেসে।

পার্বতী কথার কোনো জবাব দিল না। আপন মনে কিছু ভাবছিল। খানিক পরে বলল, "সবাই নিজের স্বার্থটি বোঝে।"

"তুমি বোঝ না?"

"বুঝতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বরাত মন্দ, সইল না।"

মহীপতি পার্বতীর হতাশ, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ভাবটা অনুভব করতে পারছিল। পার্বতীর এই মনোভাব লাঘব করার জন্যে ঠাট্টা করে বলল, "তোমার কপাল দেখে তা মনে হচ্ছে না।" বলার সময় সে পরিহাসছলে চোখ কুঁচকে পার্বতীর কপাল দেখছিল।

পার্বতী বলল, "কি মনে হচ্ছে তবে?"

"বেশ ভাল। স্বামী পুত্র সংসার নিয়ে দিব্যি সুখী।"

পার্বতী চোখ চেয়ে চেয়ে মহীপতির এই হালকা ভাবটা দেখল। কেন যেন তার রাগ হচ্ছিল। লোকটা নিতান্ত বেহায়া, নির্লজ্জ। পার্বতী বলল, "তোমার মতন পোষা সুখ সকলে রাখতে পারে না।"

মহীপতি কথাটা ঠিক বুঝল না, প্রশ্নও করল না। মুখ ভরতি করে ধোঁয়া নিয়ে ঢোঁক গিলল, গলা পরিষ্কার হলে বলল, "তুমি কি কি সত্যিই অসুখী?"

"না, সুখের মধ্যে ডুবে বসে আছি," পার্বতী এবার বিদ্রূপ করে বলল, "দেখতে পাচ্ছ না?"

"সুখের মধ্যে গলা ডুবিয়ে কে আর বসে থাকে, ভগবানও নয়।"

পার্বতী অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। মহীপতির ওপর তার রাগ হচ্ছিল, কিসের এক আক্রোশ হচ্ছে আজ ক'দিন ধরেই। এই মানুষটাই তার শনি। জীবনের প্রথমেই কুগ্রহের মতন হাজির হয়েছিল, সেই গ্রহ যাও বা কাটল, আজ এতকাল পরে আবার এসেছে। মন তিক্ত হয়ে উঠছিল পার্বতীর। বলল, "তোমার কখনও কোন অনুশোচনা হয় নি, না ?"

মহীপতি সামান্য নীরব, তারপর হালকা করেই বলল, "হয়েছে হয়ত।"

"হয়ত !"

"আমার কথা থাক। তোমার কথাই বলো।...আমাকে নিয়ে তোমার যেটুকু ছিল তার অনেক বেশি এদের নিয়ে। এরা তোমার অশান্তির কারণ হয়ে উঠল কেন হঠাৎ ?"

পার্বতী দেখল, মহীপতি তার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। শান্তভাবে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জেনেশুনে বুঝেও যে কেউ এভাবে অজ্ঞের ভান করে তাকাতে পারে পার্বতী ভাবতে পারল না। বিরক্ত হচ্ছিল পার্বতী। বলল, "তুমি জান না ?"

"তুমিই বলো।"

পার্বতীর ইচ্ছে হল বলে, সব অশান্তির মূলে তুমি, তুমি আমার জীবনের শনি। এমনই গ্রহ তুমি, তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম না। কথাটা পার্বতী বলতে পারল না, বলতে বিশ্রী লাগছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে থিয়েটার করায় তার রুচি নেই।

মহীপতি অপেক্ষা করছিল। পার্বতীর ক্রোধ ও ঘৃণা সে যতটা লক্ষ্য করছিল, ঠিক ততটা তার বিচলিত ভাব ভয় এবং নৈরাশ্য অনুভব করতে পারছিল।

পার্বতী বলল, "আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছি। কেন যে তোমায় খুঁজে বের করতে গেলুম ! ছি ছি !"

মহীপতি পার্বতীর আফসোস দেখতে দেখতে বলল, "তুমি বোধ হয় তোমার জিত দেখাতে গিয়েছিলে !"

"জিত ?"

"ওই রকম কিছু।···আমার যা মনে হয়েছে বললাম ; অন্য কিছুও হতে পারে।···কিন্তু সেকথা থাক আমি বলছিলাম, তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছ, তুমি যা ভাবছ তেমন নাও হতে পারে।"

"নাও হতে পারে!" পার্বতী অবিশ্বাসের মতন করে বলল। তারপর হঠাৎ শুধলো, "আমি কি ভাবছি তুমি তো জান। যদি তাই হয়, আমি যা ভাবছি—তাহলে কি হবে ?"

মহীপতি ভাবল সামান্য, বলল, "এখন থাক, পরে একদিন বলব তোমায়।"

"পরে ?"

"আজ আমায় তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, বাড়ি ফিরব।"

পার্বতী প্রথমে কিছু বলল না, পরে খেয়াল হলে বলল, "চা খেয়ে যাও।"

"না, আজ থাক। তাড়া আছে।"

"কিসের তাড়া ?"

"রমার," মহীপতি হেসে বলল, বলে উঠে দাঁড়াল।

পার্বতী স্থির চোখে মহীপতিকে দেখতে দেখতে বলল, "ওই মেয়েটার তুমি খুব বাধ্য বুঝি ?"

"খানিকটা—", মহীপতি হাই তুলল, "ও নিজে বড় অবাধ্য, আমায় মাঝে মাঝে বাধ্য হতে হয়।"

পার্বতীও উঠল, উঠে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মহীপতিকে।

মহীপতি চলে যাবার পর পার্বতী কিছুক্ষণ বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সামনের মাঠে ঘাসে হিম পড়তে শুরু করেছে। এখন খানিকটা ঠাণ্ডা অনুভব করা যায়। হেমন্তের আকাশ তারায় ভরা, অন্ধকার বেশ ঘন। সামনে গাছপালা কালো ছায়ার মতন জমে আছে। এলা গান গাইছিল আপন মনে, সন্তু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা গান শুনছে। পূর্ণেন্দু কোথায় গেছে কে জানে।

রবি আরও পরে ফিরবে, বেচারী অনেক আশা নিয়ে এসেছিল, হই-হুল্লোড় করে ছুটি কাটাবে, ঘুরবে বেড়াবে, এলার সঙ্গে খুনসুটি করবে, আড়ালে বুনো ফুল গুঁজে দেবে চুলে, নিভৃতে বসে গল্পটল্প করবে অন্য রকম—। তা প্রথম প্রথম তার এসব সাধ কিছু কিছু পুরলেও এখন বাড়ির যা অবস্থা তাতে তাকে অনেক আশাই ছাড়তে হয়েছে। বেচারী! বেশ ঝিমিয়ে পড়েছে রবি। এলাও যেন চারপাশের আবহাওয়ায় কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তার ঘাটশিলা আর ভাল লাগছে না। রবিকে বলছিল সেদিন, এর চেয়ে বাবা আমার হোস্টেলই ভাল। কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি।

পার্বতী বারান্দায় আরও খানিক দাঁড়িয়ে থাকল, শিউলীফুলের গন্ধ আসছে বাতাসে, কোথায় যেন কুকুর কাঁদছে।

পার্বতী বারান্দা ছেড়ে শশধরের ঘরে বাতি নিবোতে গেল। বাতি নেবাবার পর হঠাৎ তার চোখের ওপর অন্ধকার যেমন থাবা মেরে তাকে অন্ধ করে দিল। স্তব্ধ, অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পার্বতী। অনেকক্ষণ পর তার বিমূঢ় ভাবটা কাটল। চোখে ততক্ষণ অন্ধকার খানিকটা সয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তক্তপোশের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে শক্ত ভাবটা অনুভব করল, তারপর বসলো।

জানলা খোলা। জানলার ওপাশে আতা গাছের ঝোপ একটা জন্তুর মতন দাঁড়িয়ে আছে। পার্বতী চেষ্টা করল ওপর দিকে তাকাতে, আতা ঝোপের ওপর দিয়ে বাইরে তাকাতে। আতা ঝোপের পর পাঁচিল ; শ্যাওলায়-ময়লায় কালো হয়ে আছে, অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না।

এখানে বসতে ভাল লাগছিল না পার্বতীর, উঠতেও ইচ্ছে করছিল না। কয়েকবারই তার বড় বড় নিশ্বাস পড়ল, তারপর বুক নিঃশেষ করে দীর্ঘশ্বাস। বসেই থাকল পার্বতী অন্ধকারে।

মহীপতিকে তার আবার মনে পড়ল। এই মানুষটা তাকে সত্যিই শনির মতন ধরেছে। কেন? এখানে এসে পার্বতী তাকে আবার দেখতে পেল? প্রায় এক-যুগ পরে এভাবে দেখা হবার

কি দরকার ছিল। যদি বা দেখা হল, কি দরকার ছিল তার সঙ্গে বাসনাদির চেনা-শোনা থাকার ?

পার্বতী নিজের ভাগ্যের দোষ ছাড়া আর কোথাও দোষ দেখতে পেল না। তার কপাল বড় মন্দ। আজন্ম না হোক, অল্প বয়স থেকেই পার্বতী দেখেছে, তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। বাবা ছিল স্কুলের হেড মাস্টার, মোটামুটি সংসারটা চলে যাচ্ছিল, খাওয়াপরার কষ্ট, ভীষণ একটা অভাব কখনও ছিল না। সেই বাবা—কী গ্রহের ফের—একদিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে হাসপাতালে গেল। তারপর একটি পা নষ্ট হল। পার্বতী তখন নিতান্ত স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার শরীর স্বাস্থ্য কর্মক্ষমতা সেই থেকে নষ্ট হল। তবু বাবা খোঁড়া পায়ে কিছুদিন হাল ধরে থাকল। মা ছিল একপেশে, বাবার উপর মার টান বেশী। সংসারে বাবাই ছিল মার নির্ভর। অক্ষম দুর্গত বাবার ওপর সংসারের বোঝা চাপানো থাক মা এটা সহ্য করতে পারত না। মার মুখ ছিল ধারালো, শাসন ছিল ভীষণ, বদরাগী মানুষও ছিল মা।

কলেজে পড়তে ঢুকেই টিউশানি নিতে হল, এ-বেলা ও-বেলা দুটো বাচ্চা পড়াতে হত। সেই টাকায় নিজের কলেজের খরচা, গাড়ি ভাড়া, খাতাপত্তর। বাবা তখনও স্কুলের সঙ্গে কোনো রকমে সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বাড়িতে ঝি নেই, চাকরবাকর বলতে পার্বতী-ই, বাজার যাও, লণ্ড্রিতে যাও, ডাক্তার-ওষুধ করতে হলেও তুমি যাও, বৃষ্টিতে বাসন মাজার দরকার হলে ভিজে গায়ে কলতলায় বসতে হবে; ঘর মুছতেও সে। এইভাবই চলছিল। শেষে বাবা একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ল। পায়ের জন্যে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক শরীরের কৃশতা বাবাকে একেবারে বিছানায় শুইয়ে ফেলল। স্কুল আর খাতির করল না। ততদিনে পার্বতী কলেজের অনেকটা এগিয়ে গেছে। এবার অন্য টিউশনি, সেই সঙ্গে কিছু উড়ো কাজ। তারপর চাকরি। যখন চাকরিতে ঢুকছে স্কুলের, বি-এ পাস করে ফেলেছে তখন, মহীপতি তার যথেষ্ট চেনাশোনা হয়ে গেছে। পরিচয় হয়েছিল

কেতকী মারফৎ। কেতকী তার বন্ধু ছিল। মহীপতি তখন পড়ুয়া নয়, কিসের একটা চাকরি করছে ভাল। দেখতে-শুনতে সুন্দর, কথাবার্তা ঝরঝরে, আলাপ করলে মন খুশী হয়ে ওঠে। মহীপতির সঙ্গে বছর দুই ঘোরাফেরা মাখামাখি করে পার্বতী ধারণা করে নিল, মহীপতিই তার ভবিষ্যৎ। পার্বতীর তরফ থেকে কোনো দোষ ছিল না। কৈশোরের শেষ থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত সে সংসারের যে চাপ সহ্য করছিল—তাতে তার মন বয়সের কোনো খোলা জানলায় গিয়ে দুদণ্ড দাঁড়াতে পারে নি। তার সমবয়সী ও বন্ধুরা কত কি করছে, করার সুযোগ পাচ্ছে, তাদের মন কত রকম সুখেস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, অথচ পার্বতীর বেলায় কেন এসব থাকবে না। মহীপতিকে দেখে পার্বতী প্রথমটায় অত আশা করে নি, ভেবেছিল—এ তার জন্যে নয়। পরে দেখল, মানুষটি সেরকম নয়, পার্বতীকে উপেক্ষা করছে না। পার্বতী ভরসা পেল। ভালবেসে ফেলল কখন। শেষে তার দাবি বাড়ল। বলল, আমরা বিয়ে করব। মহীপতি রাজী ছিল না। পার্বতী তখন অন্ধ, ব্যাকুল। বাড়িতে তার ততদিনে একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে, চাকরি করে, তার উপার্জনে সংসার চলে। বাবা সেকেলে গোঁড়া মানুষ, মা বদবাগী স্বার্থসচেতন মেয়ে। বিয়েটা আপাতত সামাজিক ভাবে হওয়ার বাধা ছিল, বাবা-মা রাজী হত না। অথচ অপেক্ষা করার ধৈর্য পার্বতীর নেই। সে ভেবেছিল, আজ মা-বাবার যা আপত্তি, কাল সে আপত্তি থাকবে না, ওরা হজম করে নেবে। আজকাল কে আর বামুন-কায়স্থ নিয়ে মাথা ঘামায়! আসল ভয় মার অন্য জায়গায়, রোজগেরে মেয়ে বিয়ে করলে হাতের বাইরে চলে যাবে। মেয়ের ওপর এখন যে দাবি, অধিকার মা-বাপ হিসেবে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে অধিকার থাকবে না, মুখের ওপর তুড়ি দিয়ে মেয়ে চলে যাবে। এই আপত্তিটা বা ভয়টা মা ওই জাত-বংশের আড়ালে রেখে আপত্তি তুলত, ঝগড়াঝাঁটি করত, অশান্তি হত সংসারে। পার্বতী তা চায় নি। ভেবেছিল, বিয়েটা গোপনে সেরে রাখুক, তারপর ক্রমশই সে উলটো চাপ দিয়ে, মা-বাবাকে

হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে কাজ গুছিয়ে ফেলবে।

…বিয়ের ঝোঁকটা পার্বতীকে এমন পেয়ে বসেছিল যে, মনে হত —পার্বতী তার ভবিষ্যতের ভিতটা পাকা করে রাখতে চায়। তার এই ঝোঁক অনেকটা ছেলেমানুষি; তবু এর মধ্যে তার হিসেবীপনা ছিল। সে নিশ্চিন্ত, নিশ্চিত হতে চাইছিল। কাঙালের ধনই বলো, আর লোভীই বলো—পার্বতী তার নাগালের বাইরে কিছু যেতে দেবে না বলেই পাগল হয়ে গিয়েছিল যেন। তাছাড়া পার্বতী এসব ব্যাপারে খানিকটা খেয়ালী, খানিকটা কল্পনাপ্রবণ, স্বপ্নালু ছিল। মনে মনে সে রোমাঞ্চ অনুভবের খেলা খেলত। বিয়ের সময় সে বোধ হয় ভেবে মজা পাচ্ছিল যে সকলের চোখের আড়ালে তারা—সে আর মহীপতি—যুগ্ম ও দাম্পত্য জীবনের শরিক হয়ে থাকবে, আর বাইরে —সমাজের কাছে যুবক-যুবতী, প্রেমিক-প্রেমিকা। এই ধাঁধা কিছুদিন বেশ চলবে, তারপর একদিন সব ধাঁধা পরিষ্কার। ও মা, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, হাতে শাঁখা, ওদিকে জোড়া বিছানা, বালিশ, এক ঘর, এক খাট; তবে বুঝি বিয়ে হয়ে গেল। ভাবলে হেসে লুটোপুটি খেত পার্বতী। এর সঙ্গে আরও একটু ছিল, সচেতন ভাবে হয়ত পার্বতী বোঝে নি। সংসারে সে যত বোঝা, ভার, দায়-দায়িত্ব পেয়েছে, কাঠিন্য দেখেছে, তার কণামাত্র ভালবাসা, মমতা, স্নেহ পায় নি; বা অনুভব করে নি। পার্বতী এসব পাবে কিনা তারও স্থিরতা ছিল না। কাজেই সে যা পাচ্ছে তা তাড়াতাড়ি পেতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

বিয়েটা হল। লুকিয়ে। রেজিস্ট্রি অফিয়ে গিয়ে। মহীপতি দু জন সঙ্গী এনেছিল, পার্বতী বলেছিল আনতে। আর পার্বতীর ছিল একজন। বিয়ের পর রেস্টুরণ্টে গিয়ে খাওয়াদাওয়া হল। সঙ্গীরা বিদায় নিল। রাস্তায় নেমে দেখা গেল, দুপুরের আবহাওয়া থমথমে, কালবৈশাখী উঠবে যেন। বৈশাখের আকাশ কেমন ঘোলাটে!

পার্বতী বলল, "আমার ক'রাত ঘুম নেই; চলো তোমার বাড়ি, ঘুমোবো।"

মহীপতি একা থাকত। বলল, "চলো।"

মহীপতির বাড়িতে এসে ঘরদোর ভেজিয়ে পার্বতী বিছানায় শুয়ে পড়ল। বলল, "আর কি, এসো; শোও।···খুব বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক। সন্ধ্যেবেলায় জলে ভিজতে ভিজতে আমায় বাড়ি পৌঁছে দিও তা হলেই হবে।···এখন তো তোমারই দায়।" বলে পার্বতী হাসল।

মহীপতিও এসে বিছানায় শুলো।

যখন ঘুম ভাঙল তখন অন্ধকার। পার্বতী বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মহীপতি তখনও ঘুমিয়ে।

শাড়ি জামা গুছিয়ে পার্বতী মহীপতিকে নাড়া দিয়ে ডাকল, "এই, শুনছ? ওঠো, সন্ধ্যে হয়ে গেছে; বৃষ্টি পড়ছে। ওঠো, আমায় বাড়ি পৌঁছে দাও।"

মহীপতি সেদিন বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তার পরেও অনেকদিন। শেষে একদিন আর এল না।

মহীপতি হঠাৎ রাতারাতি কোথায় পালিয়ে গেল।

পার্বতী অপেক্ষায় থাকল, প্রত্যাশায় থাকল, চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়ে থাকল। মহীপতি আর এল না।

॥ সাত ॥

যতক্ষণ না থার্মোমিটারটা তুলে নিল মহীপতি ততক্ষণ রমা ভয়ে কাঠ হয়ে, চোখ বন্ধ করে থাকল। তার মুখ দেখে মনে হবে, গায়ের ওপর যেন বিছে বা শুঁয়োপোকা ফেলে দিয়েছে কেউ। থার্মোমিটার তুলে নেবার পব সে আস্তে করে চোখ খুলল, তারপর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

মহীপতি থার্মোমিটার দেখল। জ্বর ছেড়ে গেছে। গায়ে ঘাম দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছিল মহীপতির, শরীরের তাপও বিশেষ অনুভব করা যাচ্ছিল না।

থার্মোমিটার রেখে মহীপতি বলল, "ওষুধ খেয়েছিস?" রমাকে সে কখনও 'তুই' বলে কখনও 'তুমি'; সচরাচর 'তুই'।

রমা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এটা পুরোপুরি মিথ্যে কথা। মহীপতির বিন্দুমাত্র বুঝতে কষ্ট হল না, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রমার ঘাড় নাড়া থেকেই এটা বোঝা যায়।

রমার শাড়িব অগোছালো আঁচল টেনে মহীপতি ওর হাতে গুঁজে দিল। "গায়ের ঘাম মুছে নে। ঘেমেছিস কত। তাড়াতাড়ি মোছ।"

রমা বিছানায় বসে ঘাড় গলা বুকের ঘাম মুছতে লাগল, মুছতে মুছতে মহীপতির দিকে তাকিয়ে বলল, "পিঠ...।" আঁচলের অংশটা সে মহীপতির দিকে বাড়িয়ে দিল। দিয়ে গাঁয়ের জামা তুলে পিঠ ফেরাল। রমার গলার স্বর ভাঙা, সামান্য মোটা, জিবের জড়তা আছে, দু একটা সাধারণ কথাবার্তায় বোঝা যায় না, একটানা কথা বললে তার অস্পষ্ট উচ্চারণ ও জড়তা কানে লাগে।

মহীপতি পিঠ মুছিয়ে দিল। হাত দিয়ে আরও একবার পিঠ ঘাড় স্পর্শ করে দেখল, গা বেশ ঠাণ্ডা।

পুরোনো ম্যালেরিয়ার খানিকটা বোধ হয় থেকে গেছে রমার। ভাল আছে তো আছেই, তারপর হুট করে একদিন জ্বর এল, মেয়েটা

কাঁপতে কাঁপতে শীতের দাপটে হাতের সামনে যা পায় সব গায়ে চাপিয়ে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে। কাঁপুনি যত বাড়বে তত দাঁতে দাঁতে শব্দ করবে, হু হু করে জ্বর চড়বে, তারপর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্যপ্রায়। আসেও যেমন জ্বরটা, যায়ও তেমনি হুট্ করে, কিছু ঠিক নেই— কখনও এ বেলা ও-বেলার মেয়াদ, কখনও দু চার দিন ভোগায়। বাঁধা ওষুধ আছে ঝাড়গ্রামের বাদল ডাক্তারের, বাড়াবাড়ি মনে হলে, এখানের ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হয়।

এবারের জ্বরটা ম্যালেরিয়াও হতে পারে, আবার ঠাণ্ডা লেগেও হতে পারে। পরশুদিন মাঝরাতের খোলা হিম খেয়েছে মেয়েটা, গায়ে জল লাগিয়েছে। ঘুমের মধ্যে বাবার স্বপ্ন দেখছিল, ঘুম ভাঙলে সোজা কুয়াতলায় গিয়ে কাপড় জামা কেচে, গা ভিজিয়ে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়েছে। বাবা যখন মৃত, তার স্বপ্নের সান্নিধ্যও নাকি মৃতদেহ স্পর্শের মতন। এসব যে কে শিখিয়েছে রমাকে কে জানে। হয়ত বাল্যের শিক্ষা, বা শুনেছে কোথাও। মেয়েটা এই রকমই। ওর অনেক কিছু এমন সরল ও অসঙ্কোচ যে ওকে খানিকটা আদিম স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়, আবার ওর এমন কিছু খাম-খেয়ালিপনা আছে যে ওকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। মেয়েটা নানাদিক থেকেই তার স্বভাবে বয়সের বাড় পায় নি, আবার এমন জিনিস ও পেয়েছে যা তার বয়সে কিছুটা বেয়াড়া।

অদ্ভুত স্বভাব। মাথায় কাজের ঝোঁক চাপলে সারাদিন কাজ নিয়ে থাকল, গা লাগল না তো কিছুই করল না। হাসে যখন অকারণে খিলখিল করে হাসে, পাখি দেখেও হাসে, আবার মহীপতির দাড়ি কামানো দেখেও হাসে, লজ্জা পায় যখন তখন। সারা বাড়িতে তার অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না, কোথায় গিয়ে যে লুকিয়ে থাকে কে জানে। এদিকে রাগলে সে ভীষণ হিংস্র, কাপড় জামা ছেঁড়ে, আগুনে পোড়ায়, ফুলগাছ ছিঁড়ে উপড়ে দেয়, মহীপতিকে আঁচড়ে কামড়ে একাকার করে। ভয়ও তেমনি মহীপতিকে। মহীপতির গম্ভীর গলা পেলে একবারে শান্তশিষ্ট।

মহীপতি উঠে দাঁড়িয়ে এবার বলল, "ওষুধ খা।"

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে রমা বলল, "খেয়েছি।"

"মিথ্যে কথা—।" মহীপতি কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল। ওষুধটা নিয়ে বলল। ওষুধটা.যে তেতো সে জানে।

রমা সারা মুখে বমির ভাব তুলল। নাক মুখ কুঁচকে ভীষণ ভাবে মাথা নাড়ল, না—খাবে না আর ওষুধ।

মহীপতি নিজেই ওষুধ খুঁজতে পা বাড়াল। ঘরের মধ্যেই কাঠের ছোট দেরাজ-মতন, তার মাথায় নানা জিনিসের মধ্যে একপাশে ওষুধ। মহীপতি ওষুধ খুঁজতে গিয়ে দেখল—দেরাজের মাথায় পাখির পালক, বাগানের সদ্য ফোটা মরশুমি ক'টা ফুল, ছিঁড়ে এনেছে, আদার কুচি, কাগজে মোড়া নুন।

মহীপতি ওষুধ এনে বলল, "খা—।"

রমা চোখ বন্ধ করে ঢোঁক গিলল। তার লম্বা সুশ্রী মুখ জ্বরে· শুকনো দেখাচ্ছিল।

হাসি পাচ্ছিল মহীপতির। "জল দিয়ে টপ্ করে গিলে ফেল।"

মাথা নাড়ল রমা। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ওষুধের নামেই তার বমি এসে গেছে। বমির ঝোঁক বোঝাবার জন্যেই বোধ হয় জিব বের করল।

মহীপতি এবার ওষুধের বড়িটা রমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "যা না, রাত্রে গিয়ে চান করগে যা, মরবি যখন তখন বুঝবি···।"

রমা মহীপতির হাত ঠেলে সরিয়ে দিল। দিয়ে কাতর ভাবে বলল, "কাল খাব।"

"কাল তুই ভাত খাবি, আজ ওষুধটা খা, খেলে আর জ্বর আসবে না।"

মহীপতি জোর করেই ওষুধটা খাইয়ে দিল। রমা খানিকক্ষণ শব্দ করে করে ওয়াক তুলল, বিকৃত মুখ করে থাকল, আদার কুচি খেল নুন দিয়ে। তারপর মুখ কুঁচকে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাগ করেই যেন।

মহীপতি বিছানায় বসে সকৌতুকে রমার রাগ দেখল সামান্য। তারপর আদর করে ওর কপালের চুল, গালের কাছে জমা উড়ো চুল

কানের দিকে সরিয়ে নাক টিপে দিল। বলল, "তোর নাকটা বেশ, নাকছাবি পরবি?"

সঙ্গে সঙ্গে রমা চোখ খুলল। খুলেই নিজেই নাকে হাত দিল।

মহীপতির নজরে পড়ল, রমার গায়ের জামা আধখোলা হয়ে আছে; জামাটা উল্‌টো করে পরেছে রমা। এটাও তার স্বভাব, প্রায়ই উল্‌টো জামা পরে। মহীপতি বলল, "নাঃ, তুই আর সোজা উল্‌টো চিনলি না। তোকে আর সভ্য সমাজে বের করা যাবে না রে।"

রমার জামা সম্পর্কে কোনো উৎসাহ নেই; নাকছাবির কথা ভাবছে, বলল, "নাকছাবি করে দেবে?"

"দেব; জামা সোজা করে পরতে শেখ, তবে—"

রমা সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় উঠে বসে জামা সোজা করে পরতে বসল। আঁচলটা নিয়ে গায়ে টেনে কোনো রকমে আঁচলের একটা আগা দাঁতে ধরল, ধরে জামা খুলতে গেল। দেখে মহীপতি হাসছিল। জামার হাতা খুলতে গিয়ে রমা হঠাৎ মহীপতির চোখে চোখে তাকিয়ে কি ভেবে থেমে গেল। তারপর আচমকা কী রকম লজ্জা পেয়ে গেল। "তুমি যাও," রমা আস্তে করে বলল।

মহীপতি হাসতে হাসতে উঠে পড়ল; বলল, "রাত্তিরে দুধ খেয়ে শুবি, গায়ে ঢাকা রাখবি, আর মশারি টাঙাবি।"

চলে যাচ্ছিল মহীপতি, রমা বলল, "জামা দেখবে না?"

"পরে দেখব। তুই পর।"

ঘরে এসে মহীপতি আলো জ্বালাবার আগেই গায়ের পাশে রমার স্পর্শ পেল। এরই মধ্যে রমা জামা সোজা করে পরে দৌড়ে এসেছে। তার পায়ের আশ্চর্য গুণ, এমন ভাবে পা ফেলে আসে যে শব্দ পাওয়া যায় না। মহীপতি রমার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে দীনুকে দু-একটা কথা বলতে গিয়েছিল, তারপর সোজা ঘরে এসেছে।

আলো জ্বালাবার আগেই রমা মহীপতির পিঠে মুখ ঘষতে লাগল; ক্রমেই মনে হল, সে কাতর জন্তুর মতন মুখ মাথা ঘষছে, গলায় অস্পষ্ট জড়ানো এক শব্দ উঠছিল, মহীপতির কাঁধে রমার হাত ও

নোখের চাপ শক্ত করে বসছিল।

মহীপতি আলো জ্বালল না। রমা তার পিঠে দাঁত বসিয়ে ধীরে ধীরে কামড়াচ্ছিল। হঠাৎ খুব জোরে কামড়ে দিল।

অস্ফুট শব্দ করে মহীপতি বলল, "লাগছে রে! এখন যা; পরে আসিস, আমার কাজ আছে।"

রমা হাতের নোখ নিয়ে মহীপতির গলায় আঁচড়ে দিল, কি একটা বলল বোঝা গেল না।

মহীপতি আলো জ্বেলে দিল।

আচমকা আলোর মধ্যে রমা কি রকম বিমূঢ় হয়ে চোখ বুজে ফেলল। সে জামা সোজা করে পরেছে, গায়ের আঁচল আলগা, নাকে গলায় ঘাম জমেছে, গালের মাংস যেন থরথর করে কাঁপছিল। সাদা ধারালো দাঁত দেখা যাচ্ছিল ঠোঁটের ফাঁকে।

মহীপতি কিছু বলার আগেই রমা ঘুরে দাঁড়িয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে পালাল।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে মহীপতি পার্বতীকে স্বপ্ন দেখেছিল। দেখেছিল, পার্বতী নদীতে, মহীপতিও নদীর মধ্যে বালিতে বসে আছে। বালির পর জল, জলের মধ্যে কয়েকটা বড় বড় পাথর। পার্বতী বালি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাথরে বসতে যাচ্ছিল। মহীপতি বলল, যেও না, শ্যাওলা ধরে আছে পাথরে, পা পিছলে পড়ে যাবে, ভীষণ লাগবে, কেটেকুটে রক্তপাত হবে। পার্বতী শুনল না, সে জলে নামল, তার পায়ের গোছ ভিজল, শাড়ি জলে ডুবল, তারপর হাঁটুজল। ভেজা শাড়ি জলের তোড়ে ফেঁপে ভেসে উঠল; আরও জলে নেমে পার্বতী পাথর বেয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ল, আঘাত খেল, তবু জেদ করে উঠল। উঠে ভেজা শাড়ি জামা নিয়ে পাথরে বসল, বলল, দেখেছ? মহীপতি দেখল, দূর থেকে আঘাত দেখা না গেলেও পাবতীর বিজয়িনী মূর্তি দেখা যাচ্ছিল। মহীপতি দেখছিল। এমন সময় জল বাড়তে লাগল। কিংবা স্রোত এল। মহীপতি দেখল, পাথরে জল আছড়ে পড়ছে। তারপর আশ্চর্য কাণ্ড! পাথর ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতে

এগিয়ে চলল। পার্বতী প্রথমটায় বুঝি বোঝে নি, বোঝামাত্র ভয় পেয়ে পাথর থেকে নামতে গিয়ে আর পা রাখার জায়গা পেল না, জল আর শ্যাওলা তাকে পা রাখতে দিচ্ছিল না। পাথরের চাঁইগুলো ভাসতে ভাসতে চললো। পার্বতী ভয় পেয়ে ডাকল, হাত বাড়াল, কিন্তু ততক্ষণে ভেসে যাওয়া পাতার মতন ভাসতে ভাসতে পাথরগুলো অনেক দূরে চলে গেছে।

মহীপতি বালির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে ছুটল না, ছুটে লাভ নেই। পার্বতীর জন্য তার ভীষণ দুঃখ ও বেদনা বোধ হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত নদী থেকে ফিরল মহীপতি। ফিরে আসার সময় মহীপতি দেখল, রমা নদীর পাড়ের কাছে শুয়ে ; চড়ুই শালিক ময়না টিয়া এবং কয়েকটা পায়রা তার নগ্ন বুক, পেট, পা, মাথায় বসে আছে। হুস করে করে মহীপতি শব্দ করল, হাত ওঠালো তাড়াবার ভঙ্গি করে ; অবাক হয়ে দেখল, রমা নদীর কাদা বালি, পাড়ের ঘাস ও আগাছা এবং যত রাজ্যের পাখি সমেত উঠে বসেছে। তাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর স্বপ্ন ভেঙে গেল।

স্বপ্ন ভেঙে যাবার পর মহীপতি কয়েক মুহূর্ত নিজের ঘর ও বিছানা অনুভব করল। পার্বতী নদীর জলে পাথরে বসে নেই, ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে না, রমা পাশের ঘরে শুয়ে।

পার্বতীর কথাই মহীপতি ভাবল। স্বপ্ন নিয়ে সে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না। এইমাত্র বুঝল, পার্বতীর চিন্তা তার মাথায় ভর করেছে। ঠিক যেমন তার মাথার পাশে জানলা, সেই রকম পার্বতীর চিন্তা তার মাথার ওপর ঝুঁকে বসে আছে।

আজ পার্বতী কি বলতে চেয়েছে মহীপতির বুঝতে পেরেছে। খুব স্বাভাবিক যে, পার্বতী মহীপতির ওপর আক্রোশ অনুভব করবে। কিন্তু মহীপতির কি খুব একটা দোষ ছিল ? পার্বতী যা করেছিল সেটা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত ইচ্ছায়। মহীপতি অনিচ্ছুক ছিল। কেননা সে পার্বতীর স্বভাব তখনও ভাল করে বুঝতে, নিজের মনের সঙ্গে খাপ

খাইয়ে নিতে পারে নি। বরং তার মনে হত, পার্বতী এবং তার স্বভাবে মিল তেমন নেই, অমিল বেশি। মহীপতি পার্বতীর অনেক কিছু যেমন পছন্দ করত; সেই রকম বহু জিনিস পছন্দ করত না। পার্বতীকে সে প্রথম দেখেছিল যখন তখন পার্বতীর বয়সই কম নয় তার বয়েসও কম। পার্বতীকে দেখে তার ভাল লেগেছিল। ওর চেহারার মধ্যে তখন এমন একটা ভাব ছিল যা চোখে করকর করে লাগত না, মোলায়েম আলোর মতন স্নিগ্ধ মনে হত। পার্বতীর মুখশ্রী বরাবরই ভাল, এখন অনেক পুরন্ত হলেও তখন তা ছিল না। এখন বয়েসে পার্বতীর শরীর অনেকটা ভারী হয়েছে, পুরু হয়ে এসেছে চোখ মুখ গাল, তখন ছিমছাম ছিল সব। চৌকা ধরনের মুখ, কপালের দিকটা চওড়া, কাটা কাটা নাক, ঠোঁট, চিবুক; গভীর চোখ, থুতনি সামান্য শক্ত। শরীরের গড়ন ছিল আটসাঁট। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে পার্বতীর ব্যক্তিত্ব ফোটে নি, কিন্তু বৈশিষ্ট্য ফুটেছিল। তাকে হাল্কা, চটুল, নির্বোধ মনে হত না; তার কথাবার্তা বলার ভঙ্গি এবং আচরণ থেকে তাকে শিষ্ট ও সংযত বলে মনে হত। তার নরম স্বভাব, মিষ্টতা পছন্দ করার মতন ছিল। পার্বতীর এই সব—এবং আরও কিছু কিছু মহীপতির তখন খুবই ভাল লেগেছিল। পরে কিছুদিন মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার পর অনেক কিছু তার আর ভাল লাগে নি। মানুষের ওপর-ওপর একটা মোড়ক থাকে, সচরাচর সেটাই আমরা দেখি। কখনও কখনও বাইরের মোড়কের পরও ভেতরের একটা আবরণ থাকে, তারও তলায় আসল মানুষ। এতটা না হলেও পার্বতীর ভেতরের চেহারা মহীপতির তেমন পছন্দ হয় নি। পার্বতীকে তার কি রকম হিসেবী মনে হত। যা করছে করবে সব যেন আগেভাগেই ভেবেচিন্তে স্থির করে নিয়েছে। উদ্দেশ্য সামনে রেখে পার্বতী চলছে বলেই তার মনে হত। পার্বতী স্বার্থ বুঝত, স্বার্থ নিয়ে কাজ করত। সোজা জিনিস বেঁকা করে ভাবত। তার সব চেয়ে বড় দোষ ছিল, মহীপতিকে সে তার হাতের মুঠোর জিনিস ভাবত। তার মধ্যে আধিপত্যের ভাব এবং অধিকার-বোধ প্রবল ছিল। এ ছাড়া ও মেয়ে

ভীষণ জেদী, একরোখা, বেপরোয়া ছিল। তার মধ্যে রুক্ষতা ও ধারালো ভাবও ছিল। মহীপতি ক্রমশ এ-সব বুঝছিল, বুঝছিল পার্বতী তাকে সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে চায়। তবু মহীপতি পার্বতীকে ভালবাসত। পার্বতীর মধ্যে কামতৃষ্ণা ছিল চাপা। সে সুকৌশলে এই প্রবৃত্তির দিকে মহীপতিকে আকর্ষণ করত। মহীপতির পক্ষে তা উপেক্ষা করা সম্ভব হত না। অথচ কখনও কখনও মহীপতির এই চৌর্যবৃত্তি ভাল লাগত না। মনে হত পার্বতী লোভী, হিংস্র।

বিয়েটা পার্বতী ঝোঁকে পড়ে করেছিল। মহীপতি রাজী ছিল না। মহীপতির আপত্তি, অনিচ্ছা পার্বতীকে এমন হিংস্র, নোংরা ও অস্থির করে তুলেছিল যে শেষ পর্যন্ত মহীপতি রাজী হতে বাধ্য হল। পার্বতীর নিজের তাগিদ, জেদ এবং ঝোঁকই ছিল সব। মহীপতি অবশ্য ভেবে দেখেছিল পার্বতী তার ভিত পাকা করার বাসনায় এটা করেছে। রাজী হওয়া মহীপতির উচিত হয় নি। এখানে সে ভুল করেছে। কিন্তু দুর্বলতা জয় করার মতন শক্ত সে হতে পারে নি।

লুকোনো বিয়েটা পরে প্রকাশ্যে বিয়ের চেয়েও দুঃসহ হল। যে মুহূর্তে বিয়েটা সারা হল সেই মুহূর্ত থেকে পার্বতী মহাপতির সমস্ত কিছু অধিকার করতে চাইল। তার আচরণে স্ত্রীর আধিপত্য, স্বার্থ, সতর্কতা প্রকট হয়ে উঠল। পার্বতী অসহিষ্ণু হত, ঝগড়া করত, বিরক্তি দেখাত।

মহীপতির বিতৃষ্ণা আসতে লাগল। যাতে তার অনিচ্ছা ছিল অথচ পার্বতীর জোর-জবরদস্তি ও তাগিদে পড়ে (নিজের দুর্বলতা বশেও অবশ্য) অনিচ্ছা সত্ত্বেও যা করে ফেলেছে তা তাকে আরও বিরক্ত করতে লাগল। পার্বতীর ওপর সে ক্রমেই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। সে আগেও জানত, এই ভালবাসা স্থায়ী হবে না ; গোপন বিয়ের পর আরও জানল এই দাম্পত্য জীবন টিকবে না। পার্বতীর অবস্থা সব দিক থেকে বিবেচনা করে একসময় মহীপতির সহানুভূতি হয়েছিল, এখন আর সহানুভূতি থাকল না—বিদ্বেষ হল। তার মনে হত, পার্বতী তাকে চতুরের মতন জালে জড়িয়েছে। ঘৃণা হত, রাগ হত

অবশেষে মহীপতি একদিন পালিয়ে গেল। নিজের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্যে এই চাতুর্যটুকু সে করেছে। অবশ্য সে জানত, পার্বতীর এতে ক্ষতি হবে না। ও আবার সব গুছিয়ে নিতে পারবে।

পার্বতী যে আবার নতুন করে সব গুছিয়ে নিয়েছে মহীপতি এত বছর পরে তা দেখতেও পেল। অস্বীকার করা যাবে না, মহীপতি পার্বতীকে এখানে বিজয়িনী বেশেই প্রথমে দেখেছিল। পার্বতী দেখিয়েছিল, সে হেরে যাওয়ার পাত্রী নয়, শেষ পর্যন্ত সে শক্ত জায়গায় দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, মহীপতি তা দেখেছে।

কিন্তু এখন পার্বতী দেখছে তার দাঁড়াবার জায়গা শক্ত নয়, স্থির নয়। সে ভেসে যেতে বসেছে।

মহীপতি মনে মনে অবশ্য এই বিপর্যয় আশঙ্কা করে নি। সে চায় না, পার্বতী যে পাথরের ওপর বসে আছে তা ভেসে যাক; অন্তত পার্বতী এখন—জীবনের এই গাঢ় বেলায় মনোমত কিছু করে নিতে পেরেছে। তার মূল্য থাকা উচিত। ওর চরিত্রের অতি-গোপনে কি আছে বা ছিল তা নিয়ে মাথা ঘামানো অবান্তর, পার্বতীর এই সাংসারিক রূপ কোথাও বিসদৃশ হয়ে নেই। তার সেবাযত্ন, স্নেহ, আন্তরিকতা ও মায়ামমতা অবহেলা করার মতন মূর্খতা পূর্ণেন্দুর না হওয়াই উচিত।

পার্বতীর জন্যে মহীপতির সহানুভূতি ও বেদনা হওয়া সত্ত্বেও সে ভেবে দেখছিল, বেচারী বাস্তবিকই এমন জায়গায় গিয়ে বসেছে যা শক্ত পাথর নয়। ভেসে যাওয়া অসম্ভব কি!

॥ আট ॥

ওরা সবাই সাতসকালে ধারাগিরি বেড়াতে চলে গেল; পার্বতী বাড়িতে থাকল, গেল না। রবি অনেক করে বলেছিল, অনুনয় বিনয় করেছিল; এলা দিদির কাছে খুঁতখুঁত করেছিল: সবাই মিলে না গেলে কি ভাল লাগে! পার্বতীর মন তবু টলল না।

ধারাগিরি না গেলেও রবিদের চলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। মহীপতি ব্যবস্থা করে দিয়েছে সব রকম, সঙ্গে লোক দিয়েছে, এখন না বলা বড় দৃষ্টিকটু। স্ত্রীর জেদ, একগুঁয়েমির ওপর পূর্ণেন্দুর রাগও হয়েছিল খুব। কী মনে করে পার্বতী? সংসারে সব কিছু তার কথামতন হবে? অন্য সকলের থেকে তাকে বার বার আলাদা করে দেখতে হবে, তাকে তোয়াজ করতে হবে! না যাবে না যাক্, আমরা যাব—আমি যাব। পূর্ণেন্দু যেন পার্বতীকে নিজের জেদটাও বোঝাবার জন্যে রবিকে স্পষ্টই বলল: আর কেউ যাক না যাক আমি যাব। নাচার সময় তোমরা নাচতে পার—, আর এখন না-না করবে তা চলবে না, আমি যাব। ভদ্রলোকের কাছে আমি পাগল সাজতে রাজী না।

ভেতরে ভেতরে যাই হোক ওপরে অন্তত আর কোনো গোলমাল হল না। ওরা সাতসকালে গাড়ি করে বেরিয়ে গেল ধারাগিরি দেখতে, সঙ্গে ঠাকুরটাও গেল, পার্বতী পাঠিয়ে দিল।

বাড়িতে সে একা। সামান্য বেলায় এখানকারই এক ঝি আসে রান্নার বাসনকোসন মাজতে, ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে মুছে দিতে। বাসি, ভিজে কাপড়চোপড়ও সে কেচে দেয়। ঝি এসেছিল সময় মতন। পার্বতী সাংসারিক কাজগুলো তাকে করতে বলে দিয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকল খানিক। আজ সমস্ত বাড়ি ফাঁকা, কোথাও কারও সাড়াশব্দ নেই, ঝি কুয়াতলায় গিয়ে বাসন মাজছে, অত তফাত থেকে কোনো শব্দও আসে না। কয়েকটা পাখির গলা, কাকের ডাক ছাড়া

কিছু শোনাও যায় না। নির্জন, স্তব্ধ বাড়িতে পার্বতী শুয়ে থাকতে থাকতে মাথার চুল ছড়িয়ে দেবার মতন আলস্যের সঙ্গে তার মনটাকে ছড়িয়ে দিল। ছড়িয়ে দেবার পর দেখল, তার ভাবনার কোনো স্পষ্ট চেহারা নেই, স্থিরভাবে সে কিছুই ভাবতে পারছে না। কখনও নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে, কখনও পঙ্গু অথর্ব বাবাকে, কখনও স্বার্থপর মাকে। মনে পড়লে কোথাও কোনো সুখ সঞ্চয় হচ্ছে না। বরং দুঃখ, রোষ। বাবার জন্যে দুঃখ ছাড়া আর কী হতে পারে! মার জন্যে রাগ বিদ্বেষ ছাড়া বাস্তবিকই কিছু হয় না। চূড়ান্ত স্বার্থপর মানুষ সংসারে কত যে আছে পার্বতী জানে না, যারা আছে মা তাদের একজন। মা যদি নিজের এবং সংসারের অন্নচিন্তার কথা না ভেবে একটু উদার হত তবে পার্বতী হয়ত লুকিয়ে বিয়ে করতে যেত না, সরাসরি মহীপতিকে বিয়ে করতে পারত, আর তা করলে এরকম হত না। মা আপত্তি করবে, কিছুতেই রাজী হবে না ভেবেই না পার্বতী মহীপতিকে গোপনে বিয়ে করেছিল!

গোড়ার ভুল ওখানেই। ওই ভুলের জন্যে পার্বতী বাস্তবিক হাতের কাছে স্থায়ীভাবে কিছু ধরে রাখতে পারল না।

একদিকে যেমন মা, অন্যদিকে তেমনই মহীপতি। মহীপতি তাকে ঠকিয়েছে। সুযোগ পেয়ে ঠকিয়েছে। এই সুযোগ সে পেয়েছিল; বুঝেছিল: পার্বতীর পক্ষে গোপনীয়তা তখন কত জরুরী, সে বাড়িতে বিয়ের কথা বলতে পারবে না, বাইরেও প্রকাশ করতে পারবে না। মুখ বুজে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই তার। পার্বতীর দুর্বলতা ও অসহায়তা বুঝেই দিব্যি অক্লেশে মহীপতি তাকে প্রবঞ্চনা করতে পারল। মহীপতি চতুর এবং শঠ।

নিজের ভীরুতার জন্যে, বোকামির জন্যে পার্বতীর নিজের ওপর তখন খুব ঘৃণা হত। তার সাহস বলে কিছু নেই। সাহস থাকলে এ-রকম ঘটনা এভাবে ঘটে না। যদি সাহস থাকত, পার্বতী লুকিয়ে বোকার মতন গোপনে বিয়ে করতে যেত না। হঠকারিতা বা ছেলে-মানুষি করে যদিও বা বিয়ে করেছিল, সাহস থাকলে সেটা প্রকাশ

করতে পারত। পার্বতী কোনোটাই পারে নি। বরং মহীপতি পালিয়ে যাবার পর পার্বতী ভীষণ এক ভয় নিয়ে ছিল। বলা যায় না, মহীপতির সঙ্গে যেভাবে সে শোয়াবসা করে দিন কাটিয়েছে তাতে তার কিছু একটা হয়ে যেতে পারে, সেরকম সম্ভাবনা রয়েছে। যদি তাই হয়, পার্বতীর পেটে বাচ্চাকাচ্চা এসে গিয়ে থাকে সে কী করবে! সমস্ত কিছু তাকে বলতে হবে। মহীপতি পালিয়ে যাওয়ায় যত না উদ্বেগ দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছিল তখন, তার চেয়েও বেশি উদ্বেগ ছিল এই সম্ভাবনা সত্য হয়ে যেতে পারে ভেবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য এই বিশ্রী উদ্বেগটা কাটল। তখন মহীপতিকে আর যাই মনে হোক লজ্জাসম্ভ্রম, আত্মমর্যাদার জন্যে প্রয়োজনীয় মনে হয় নি। পার্বতী এক দিক থেকে অন্তত স্বস্তি পেয়েছিল।

পরে মহীপতির প্রতি বিরাগ, বিরক্তি ঘৃণাবশে পার্বতীর কখনও কখনও আচমকা মনে হত: পার্বতী সত্যিই যদি সন্তানসম্ভবা হত, মহীপতি থাকতে থাকতেই, তবে ভাল হত। ভাল হত, কারণ, সেরকম ঘটলে মহীপতি পালাতে পারত না, সে বাঁধা পড়ত। পার্বতী তবে বেঁধে ফেলত। যে সাহস পার্বতীর ছিল না, তখন নিজের মানসম্মান লজ্জা বাঁচাতে বাধ্য হয়ে পার্বতীকে সেই সাহসের পরিচয় দিতে হত। কে বলতে পারে, হয়ত এতেই ভাল হত।…ভগবান সব দিক দিয়েই মহীপতিকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভোগ যা সবই পার্বতীর।

শুয়ে থেকে থেকে এই সব অবান্তর কথা ভাবতে ভাবতে পার্বতী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। তার আর ভাল লাগছে না।

বাইরে এসে পার্বতী ঝিকে ডেকে স্নানের জল দিতে বলল। এখন তেমন কিছু বেলা নয়, তবু স্নান করে নেওয়া ভাল।

আজ কোথাও কিছু করার নেই বলেই হয়ত পার্বতী মাথার চুল এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে মোটা চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াল, অনেকক্ষণ ধরে চুল পরিষ্কার করল, তারপর মাথায় তেল দিতে গিয়ে কী ভেবে ঠিক করল মাথা ঘষবে আজ, মাথায় অনেক ধুলো জমেছে; তেলের শিশিটা রেখে দিল পার্বতী।

একসময় পার্বতীর মাথা ঘষার খুব বাতিক ছিল। এখন কমেছে। একেবারেই সে-বাতিক নেই যে তা নয়, তবে আগের তুলনায় অনেক কম। ঘাটশিলায় এসে পর্যন্ত একদিনও মাথা ঘষা হয় নি। রাজ্যের ধুলোময়লা মাথায় জমেছে।

মাথা ঘষার জিনিসপত্র, তোয়ালে, টুকিটাকি গুছিয়ে পার্বতী স্নানের ঘরে ঢুকল। স্নানের ঘর বলতে একটা ছোট কুঠরি মতন, এক-পাশে ছোট চৌবাচ্চা, অন্যপাশে উঁচুতে দেওয়াল ঘেঁষে লোহার একটা ছড় কাপড়চোপড় রাখার জন্যে গাঁথা রয়েছে। মাথার ছাদটা এমনই নীচু যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্নান করতে অসুবিধে হয়, হাত লেগে যায় ছাদে, এদিক ওদিক নড়াচড়ার উপায় নেই।

চৌবাচ্চায় জল নেই। বাসি জল ফেলে পরিষ্কার করে দিয়েছে ঝি। দু বালতি টাটকা জল তুলে দিয়ে গেছে পার্বতীর স্নানের জন্যে।

কলঘরের দরজা তেমন কিছু নয়। তবু ওটা এখনই ভেজিয়ে দিল না পার্বতী। ভেজিয়ে দিলেই কলঘরের মধ্যে অন্ধকার মতন হয়ে আসে, কনকনও করে খুব। কেউ কোথাও নেই, বাড়ি ফাঁকা, ঝি ছাড়া এদিকে কেউ আসছে না। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পার্বতী কলঘরের প্রায় চৌকাটে বসেই মাথা ঘষতে শুরু করল।

সামনেই একটা ঝাঁকড়া গাছের ঝোপ, সরু সরু পাতা; তার ওপাশে করবী। বাঁ দিকে বেড়া, বেড়ার গায়ে কলা গাছ, ওদিকে কুয়া। অনেকটা তফাতে শিউলি গাছ। করবী গাছ ছাড়িয়ে রোদ চলে এসেছিল। কলঘর পর্যন্ত রোদ আসতে আরও অনেকটা সময় যাবে।

মাথার চুলে ফেনা জমে উঠেছিল। মুখ নীচু করে দু হাতে চুলের গোড়া ঘষতে ঘষতে পার্বতী পাখির ডাক শুনল। কী পাখি কে জানে, কিন্তু ডাকটি বেশ নরম, সরু। মাথা তুলে একবার দেখার চেষ্টা করল পার্বতী; কপাল দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে মাথা ঘষা কালচে সাবানের জল গড়িয়ে পড়ছে, চোখ জ্বালা করে উঠল।

কলকাতার কথা আচমকা মনে পড়ে গেল পার্বতীর। তারা যে বাড়িতে থাকত, ভাড়াটে বাড়িতে, সেখানে উঠোনের লাগোয়া কলঘর

অনেকটা এই রকম ছিল : ছোট, অন্ধকার, কোনো রকমে আড়াল দেওয়া। বেশ নোংরাও ছিল। মেঝেটা পেছল ছিল খুব। পার্বতী একবার মাথা ঘষার সময় সাবান আর সোডার (তখন সোডা ব্যবহার করতে হত) জলে চোখমুখ অন্ধ করে নড়াচড়া করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। কোমরে ভীষণ লেগেছিল, মনে হয়েছিল—বুঝি হাড় ভেঙে গেছে। উঠে দাঁড়াবার সাধ্য ছিল না, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছিল। শব্দ শুনে দোতলার সেই অমিয়া বউদিই প্রথমে এল, উঠোনেই ছিল কাছাকাছি কোথাও। বাইরে থেকে কলঘরের দরজা ও-বাড়িতে দিব্যি খোলা যেত। দরজা খুলে অমিয়া বউদি পার্বতীকে কোনো রকমে তুলে দাঁড় করালো, চোখেমুখে জল দিয়ে পার্বতী অনেক কষ্টে চোখ খুলতে পারল। আর চোখ খুলতেই দেখল : কলঘরের সামনে বিভূতি দাঁড়িয়ে। মজা দেখছিল বিভূতি, আরও অনেক কিছু দেখছিল। মা ততক্ষণে এসে গেছে। মা আর অমিয়া বউদি মিলে পার্বতীকে কলঘর থেকে নিয়ে যেতে পারত, বিভূতিও সর্দারী করে এগিয়ে এল। মা তার স্বভাব মতন চেঁচামেচি, গালিগালাজ করছিল ; সেই সুযোগে বিভূতি এসে মাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই পার্বতীর একটা পাশ ধরল। পার্বতীর যন্ত্রণা তখন খুব, কিছু বোঝার উপায় ছিল না। ওরই মধ্যে পার্বতী বুঝতে পারল, বিভূতি তার উদ্দেশ্য সাধন করে নেবার চেষ্টা করছে। এর পর থেকে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছিল : পার্বতী যখনই মাথা ঘষত, বিভূতি সেটা লক্ষ্য করলেই হাসত। পার্বতী যে মাথা ঘষেছে সেটা জানার অসুবিধা ছিল না—কেননা সেদিন তার মাথার চুল রুক্ষ, ফোলানো, ফাঁপানো থাকত। বিভূতি চট করে ধরে নিতে পারত।

বিভূতি এ-রকম আগাগোড়াই করে এসেছে। কেন করেছে পার্বতী জানে, তবু সন্দেহও হয়। মজার জন্যে, নাকি পার্বতীকে কিছু বোঝাতে চাইত বিভূতি। মার অবশ্য একবার ঝোঁক হয়েছিল, বিভূতির সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে দেয়। বিভূতি পোস্ট অফিসে চাকরি করত, অন্য সময়ে একটা ছোটখাটো মণিহারি দোকান দেখত।

পার্বতীর চেয়ে বয়সে বড়ই ছিল। একই বাড়ির ভাড়াটে। মাকে ধারে জিনিসপত্র দিত, হয়ত দু-দশ টাকা কর্জও দিয়েছে।

মানুষটাকে অপছন্দ করার কিছু ছিল না। সাধারণ মানুষ যা হয়। বরং তার সাংসারিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। সজাতিও ছিল। বিভূতির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে ঝঞ্চাট চুকে যেত তখনই। তবে বিয়েটা—বা মার ঝোঁক বেশি দিন থাকে নি। কেননা পার্বতী ও ব্যাপারে কান তো করতই না, উপরন্তু সে তখন নিজেই উপার্জনক্ষম হয়ে উঠেছিল।

একদিন বিভূতি সুযোগ বুঝে ফাঁকা, নেড়া ছাদে পার্বতীকে ধরেছিল। বলেছিল ঃ তোমার জন্যে মাইরি এই বাড়িটায় এখনও রয়েছি; একটা ফায়সালা করে ফেল। অন্তত একদিন চলো কোথাও—দুজনে ঘুরে আসি।

পার্বতী ঘুরতে টুরতে যায় নি, ফায়সালাও করে নি। করলে খারাপ কিছু হত না। তেমন করে দেখলে বিভূতির মতন লোকই তো লক্ষ লক্ষ; সাধারণ, ছাপোষা মানুষ, পাঁচ ভাঁড়ার কুড়িয়ে সংসার চালায়, ঘর ভাড়া করে, বিয়ে করে, নতুন বউকে নিয়ে সিনেমায় যায়, বেলফুলের মালা কিনে দেয়, রাত্রে বিছানায় গায়ের কাছে জড়িয়ে নিয়ে শোয়, তারপর যথানিয়মে বাচ্চাকাচ্চা, সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগ—এই সব নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। এদের সংসারে যা আসে তার বেশি পার্বতীর আশা করা উচিত হয় নি। বলতে নেই, বিভূতি কিছু মন্দ করে নি, হামেশা হাজারে হাজারে যৌবন বয়সের পুরুষ এই করছে। পার্বতীর গায়ে কবে একটু হাত দিয়ে মজা পেয়েছিল, মনে মনে পার্বতীকে কামনা করত—এতে বিভূতিকে দোষ দেবার কিছু নেই। সত্যিই যদি বিয়ে হয়ে যেত পার্বতীর বিভূতির সঙ্গে, খারাপটা কী হত ? কিছু না। ভাড়াটে বাড়ি, রান্নাঘর, সংসার, বিছানাবালিশ, লক্ষ্মীপুজো, বাচ্চাকাচ্চা নিয়েই জীবনটা কাটত। বিভূতি তাকে ছেড়ে পালাত না। এরা পালায় না। সে সুযোগ এদের নেই। যা হাত পেতে নেয়, আমরণ সেটাই নাড়াচাড়া করে

কাটায়। এরা ভাল, ভাল এই জন্যেই যে, সাদামাটা বিস্বাদ এই সংসারকে এরা ভাগ্যের পাওনা হিসেবেই স্বীকার করে নেয়, তার জন্যে অনর্থ করে না, তাকে এড়িয়ে যায় না।

মাথার শ্যাম্পু, সাবান, জল—সব যখন কপাল গাল গড়িয়ে দরদর করে ঝরে পড়ছে, ভুরু আর নাক গড়িয়ে চোখে পড়েছে—তখন পার্বতীর হুঁশ হল। চোখ জ্বালা করে উঠেছে। আঙুল দিয়ে চোখ মোছার সময় পার্বতী বেশ বুঝতে পারল, সাবানের জল আর চোখের জল একাকার হয়ে গেছে।

দুপুর তখন সবে গড়িয়েছে। ঘুম থেকে উঠে পড়ল পার্বতী। চোখেমুখে জল দিয়ে খানিকটা সময় ঘরের জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর কি মনে করে নিজের ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। একেবারে সাদামাটা বেশ, পায়ে চটি, ঘরের চাবিগুলো হাতের বটুয়ায়। মাথার চুল রুক্ষ, ফাঁপালো। পিঠের ওপর দিয়ে আঁচলটা শক্ত করে টেনে নেওয়ায় ঘাড়ের তলায় চুলগুলো দেখা যাচ্ছে না।

রাস্তায় এসে একটা রিকশা পেয়ে গেল পার্বতী। উঠে বসল।

তারপর সোজা মহীপতির বাড়ি।

কুকুরের ভয়ে সরাসরি ফটক খুলে ঢুকতে সাহস পেল না পার্বতী, মহীপতিকে ডাকতে লাগল।

মহীপতি নয়, বাড়ির পেছন থেকে রমা এসে হাজির। কাছাকাছি কোথাও বুঝি ছিল।

ফটকের সামনে এসে রমা একটুক্ষণ পার্বতীকে দেখল। তারপর ভুরু কুঁচকে রাগের মুখ করে ফটকটা খুলে দিল।

পার্বতীর এটা ভাল লাগল না। মহীপতির নাম করল না পার্বতী, শুধু ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে বলল, "আছে বাড়িতে?"

রমা এমন ভাবে মাথা হেলাল যাতে মনে হবে, থাকতেও পারে, নাও পারে। খুঁজে নাও।

মহীপতি স্বাভাবিক ভাবে পার্বতীর মুখ দেখতে দেখতে বলল, "তোমার একটা বড় দোষ এখনও গেল না।"

পার্বতী সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে মহীপতির দিকে তাকাল। "আমার দোষ? কি দোষ?"

হাসি মুখে মহীপতি বলল, "যা করো বাড়াবাড়ি ভাবে করো।" বলে মহীপতি যেন পার্বতীকে কৌতুক করেই বলছে এমনভাবে বলল, "শশধরবাবুদের ওপর চটলে তো এমনই চটলে যে ওদের নামটুকুও আর শুনতে পার না।"

অল্প চুপ করে থেকে পার্বতী জবাব দিল, "আমি অনেক কিছুই পারি না। তুমি পার?"

"কথাটা অন্য ভাবে নিয়ো না।"

"আমার কাছে এ-ভাব আর সে-ভাব নেই। আমি যা পারি না তা পারি না। তুমিও পার না।"

"আমার কথা বাদ দাও। তুমি তোমার কথাটা ভেবে দেখছ না। স্বামী পুত্র নিয়ে তুমি একটা সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসেছ, ছোট বোন রয়েছে, তোমার পক্ষে এরকম বাড়াবাড়ি চলে না। শশধরবাবু ভাল লোক নয়; আমি স্বীকার করছি, তারা খারাপ। কিন্তু ওদের সঙ্গে তুমি যা করছ তাতে তোমারই ক্ষতি হতে পারে। সাধারণ একটা বুদ্ধি তোমার থাকা দরকার।"

পার্বতী মহীপতির মুখ দেখল খানিক। তারপর ব্যঙ্গের গলায় বলল, "সাংসারিক বুদ্ধি তোমারই বেশি দেখছি।"

"সাংসারিক নয়, সাধারণ…"

"তোমার বোধ হয় ভাবনাও হচ্ছে।"

"আমার ভাবনার চেয়ে তোমার ভাবনাই বেশি হওয়া উচিত। তুমি যে ভয় পেয়েছ তাও তুমি লুকোতে পার নি।…আমার মনে হয়, নিজের জন্যেই তোমার এবার সাবধান হওয়া দরকার।"

পার্বতী মনে মনে কিছুই অস্বীকার করতে পারল না। মহীপতি মুখে যা বলছে, পার্বতীকে আজ ক'দিন ধরে নিত্য তা সইতে হচ্ছে।

সর্বনাশ তার হতেই পারে—, কে জোর করে বলতে পারবে, কাল পরশু কিংবা ক'দিন পর পার্বতীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে না ! যেতে পারে।

সব জেনেশুনে বুঝেও পার্বতী যেন নিজের ভয় খানিকটা উপেক্ষা করার জন্যে করুণ করে হেসে বলল, "তেমন হলে তোমার কাছেই আসতে হবে।"

মহীপতি কিছু বলল না, বলার কিছু নেই, নিতান্ত ব্যঙ্গ ছাড়া এ কথার কোনো অর্থ নেই।

চাকর এসে চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে পার্বতী বলল, "ওরা কখন ফিরবে ?"

"বিকেল নাগাদ।"

"বিকেল তো হয়ে গেল।"

"ফেরার সময়ও হয়ে এসেছে, তবে অনেকটা পথ, এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ আর থাকবে না।"

দুজনেই চুপ করে গিয়ে চা খেতে লাগল।

কিছু পরে পার্বতী বলল, "আমার বাড়ি বন্ধ। সব ঘরেই তালা দেওয়া। ঠাকুরটাও নেই। আমায় উঠতে হবে এবার।...তুমি যাবে ?"

ঘাড় নেড়ে সায় দিল মহীপতি। "যাব। তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসব।"

"ফিরে আসবে কেন ?"

"একটা বড় কাজের কথা হচ্ছে। তার হিসেবপত্র করতে লোক আসবে।"

কি মনে করে পার্বতী হেসে বলল, "তুমি পুরো ব্যবসাদার হয়ে উঠেছ, না ?"

মহীপতি হেসে জবাব দিল, "পুরোপুরি।"

"টাকা-পয়সা অনেক করেছ ?"

"অ—নেক।"

"ঠাট্টা নয়, সত্যি বলো—খুব বড়লোক হয়ে গেছ ?"

"তোমার কী মাথা খারাপ! ব্যবসার পয়সা! কখনও আসে, কখনও যায়। মোটামুটি চলছে।"

পার্বতী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কি ভেবে হেসে বলল, "তোমার কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে আমি কোথাও চলে যাব।"

মহীপতি উঠল। পার্বতীকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে ; রাগী জেদী উদ্ধত নয়, দুঃখী ম্রিয়মান ম্লান। মহীপতি বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মনে হল ভাঙা পাত্র জোড়া দেবার মতন পার্বতীর কোথাও একটা বিসদৃশ ভাব আছে। ক'দিন আগেও পার্বতীকে এরকম দেখায় নি।

বাগানে নেমে আস্তে আস্তে হাঁটছিল পার্বতী। মহীপতি একটা সিগারেট ধরাল। পার্বতী হাত বাড়িয়ে একটা গাছ থেকে কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিল।

ফটক পেরিয়ে এসে পার্বতী হঠাৎ হেসে উঠল।

"তোমার কাছে আমি একটা মাসোহারা দাবি করতে পারি। কি বলো?" পার্বতী হেসে হেসেই বলল।

মহীপতি কথাটার গুরুত্ব দিতে চাইল না ; বলল, "বোধ হয়..."

"বোধ হয় কেন? বাঃ!...তুমি আমায় ছেড়ে পালিয়ে এসেছ —"

"তুমি আবার বিয়ে করেছ।...কিন্তু এসব কথা থাক্ না। তোমার যদি মাসোহারা দরকার হয়, আর আমার কাছ থেকে নেবার মন থাকে—তখন কথাটা ভাবা যাবে। এখন ওটা থাক্।"

পার্বতী থামল না। বলল, "থাকবে কেন, এটা হতে পারে। আমার স্বামীকে বাসনাদিরা যে কোনো সময় কথাটা বলে দিতে পারে। তখন আমার স্বামী আরেকজনের বিয়ে করা বউকে নিজের বউ করে রাখতে চাইবে কেন? মাথা কামিয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে..."

"আঃ, পার্বতী—", মহীপতি অস্বস্তি এবং বিরক্তি বোধ করে বলল, "ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত ওটা থাক্।"

"আমার জন্যে একটা আশ্রম-টাশ্রম খুঁজে রেখো।" পার্বতী

হাসছিল।

মহীপতি বলল, "রাখব। নাও, রাস্তা দেখে চলো, সামনে গাড্ডা।"

পার্বতী কিছু খেয়াল করল না, গ্রাহ্যও করল না। বলল, "বিধবা আশ্রম খুঁজে রেখো। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলব, আমার দু-দুটো জলজ্যান্ত স্বামী—তবু আমি বিধবা।"

পাগল হয়ে যাবে নাকি ও? মহীপতি পার্বতীর হাত ধরে আচমকা জোরে এক ঝাঁকুনি দিল, "কী পাগলামি করছ!"

পার্বতী ততক্ষণে প্রায় কেঁদে ফেলেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সন্তুকে আমি কী বলব, সন্তু আমায় কী বলবে···ছি ছি।"

মহীপতি এবার কিছু বলল না। পার্বতী এই নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে মরা বিকেলের ছায়ায় যদি কাঁদতে চায় একটু কেঁদে নিক। বোধ হয় এই কান্নাটুকু অনেকক্ষণ থেকে জমে আছে।

পার্বতী ঠোঁট কামড়ে কান্নাটা প্রায় দমন করে ফেলল। তারপর নীরবে মেঠো পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

॥ নয় ॥

সকালে বাজার যেতে যেতে রবি বলল, "কি হল, তোমার পা যে চলছে না।"

এলার পা সত্যিই চলছে না। কাল ধারাগিরি বেড়াতে গিয়ে আসাযাওয়া, হাঁটাহাঁটি, জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পায়ের অবস্থা বেতো রুগীর মতন হয়ে গেছে। সারা পায়ে ব্যথা, কোমর পর্যন্ত টনটন করছে। শরীরেও অবসাদ কম নয়, কেমন ভার হয়ে আছে। সন্ধ্যের আগে আগে বাড়ি ফিরে কাপড়জামা বদলে গা-মুখ ধুয়ে সেই যে বিছানায় গিয়ে শুয়েছিল, সারারাত মরার মতন ঘুমিয়েছে। খুব সকালেই অবশ্য ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে, ঘুম ভাঙার পর আলস্যের মধ্যে শরীর হালকা লাগছিল, মনে হচ্ছিল —কালকের সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে গিয়েছে।

চা খেয়ে প্রতিদিনের মতন বাজারে বেরোবার সময় পূর্ণেন্দু এল না। বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। সন্তুকে পার্বতী আসতে দিল না। কালকের সারাদিনের ধকলের পর আজ আবার বাজারে বেড়াতে এসে মাথায় রোদ লাগাবার দরকার নেই।

রবি আর এলা বাজারে বেরুলো। এলার বাজার যাবার ইচ্ছের চেয়েও যেটা বেশি সেটা রবির সঙ্গলাভ। দুজনে আলাদা ভাবে বেশি সময় থাকতে পারে না। ইদানীং সে সুযোগ কিছু বেড়েছে। শশধররা থাকবার সময় দল বড় ছিল, কেউ না কেউ সঙ্গে থাকত; এখন দল কিছুটা ছোট, তার ওপর মন-কষাকষির জন্যে সবাই আলাদা আলাদা থাকছে বেশির ভাগ সময়, ফলে এলা আর রবি কিছু সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যতই হালকা মনে হোক, পরে আর অত সুস্থ মনে হচ্ছিল না; বাজারে বেরিয়ে এলার তো হেঁটে-চলে বেড়াতেই কষ্ট হচ্ছে।

এলা বলল, "আর তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না।"

রবি অনেক আগেভাগেই সেটা বুঝেছে। রঙ্গ করে বলল, "ধারাগিরি তোমাদের একেবারে ধরাশায়ী করে দিয়েছে! কী শরীর-স্বাস্থ্য রে, বাবা!"

এলা চোখ বেঁকিয়ে বলল, "আমার শরীর-স্বাস্থ্য মোটেই খারাপ নয়।"

"না, খারাপ নয়; ওই মাথাব্যথা, পা টনটন, দাঁত কনকন—এই যা একটু আধিব্যাধি।" রবি মজা করে বলছিল আর হাসছিল।

এলা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল, "তোমার মতন স্বাস্থ্যচর্চা আমরা করি না।"

"করে দেখো।"

"থাক্ আমায় করতে হবে না।"

"হেলথ্ ইজ ওয়েলথ্—, রচনা লেখ নি?"

"এবার লিখতে দিলে লিখব।" এলা ঠাট্টা করে হাসল।

"কি লিখবে?"

"সকালে উঠে দশটা লাফ মেরে দাঁতনের ডাল ভাঙা। তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে দাঁতন, খালি পায়ে হাঁটা, দু-গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া…", বলতে বলতে এলা খিলখিল করে হেসে উঠল।

রবিও উচ্চস্বরে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "ফুল মার্কস…দশের মধ্যে বারো।"

এলা রাস্তার মধ্যে খুব সতর্ক ভাবে একটু জিভ ভেঙাল। "দয়ার অবতার।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে রবি বলল, "একটা রিকশা ধরব নাকি এলা?"

"না।"

"তুমি যে রেটে হাঁটছ বাজারে গিয়ে দেখব মাছি উড়ছে।"

"ভালই হবে।"

"ভালই হবে কেন। আজ কি আমাদের নিরম্বু উপবাস?"

"নিরম্বু মানে জান ?"

"মানেতে কি আসে যায় ! এলা মানেটা কি ?"

এলা কিছু বলল না। এলা মানে যে কী, সে জানে না।

রবি বলল, "জানো না ?"

"তুমিই বলো না শুনি।"

"এলা মানে এলিয়ে পড়া…একেবারে কাত্—", বলে রবি হাস্যকর ভাবে একটা এলানো ভঙ্গি করল।

হাসি পেয়েছিল খুব। তবু হাসি চেপে এলা বলল, "মানের জাহাজ… !"

"আরে, সত্যি—", রবি বিশ্বাস করানোর মতন চোখমুখের ভাব করল, "বাই গড্, সত্যি বলছি…। এলা মানে আলসে, আয়ড্ল্…"

রাগের ভান করে এলা বলল, "বেশ, আলসে।"

দু-পা হেঁটে রবি হেসে হেসে আবার বলল, "আরও একটা মানে আছে। কি বলো তো ?"

"রাস্তার মধ্যে তোমার মাস্টারি থামাও।"

"আহা মানে জানতে দোষ কি ?"

"আমি জানব না।"

"নিজের নামের মানে জানবে না ? আরে ছোঃ, লোকে বলবে কী !… শোনো, এলার আর একটা মানে হচ্ছে এলাচ, তার মানে— যা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে। তার আরেক মানে তুমি সুগন্ধ।"

মানের বহরে এলা হেসে ফেলেছিল। বলল, "আমি কারও মুখ-টুখের দুর্গন্ধ দূর করি না।"

রবি এবার পথ হাঁটতে হাঁটতে নিজের দুগালে হাত বোলাল, দু-একবার নাক টানল, জোরে জোরে বারকয়েক মুখ খুলে হা-হা করল, তারপর গভীর চিন্তার মুখ করে বলল, "না, কাল তুমি আমার মুখের গন্ধ বেশ দূর করে দিয়েছ। আজ বেশ রিফ্রেশিং লাগছে।"

লজ্জায় এলার মুখ আরক্ত হল। চারপাশে তাকিয়ে দেখল— পাশে কোনো লোকজন আছে কিনা।

"অসভ্য !" এলা চোখমুখ নীচু করে ধমকে উঠল।

বাকি পথটুকু এলা কথাবার্তা বেশি বলল না। এক-একরকম লজ্জা থাকে যা ভিজে কাপড়ের মতন, গায়ে ছোঁয়া লাগলে, আর তা লাগেই, সব সময় অস্বস্তি, যতক্ষণ না কাপড় শুকোচ্ছে বা কাপড়টা বদলে নেওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ স্বস্তি থাকে না। বোধ হয় এলার এই ধরনের এক লজ্জা হচ্ছিল যার ফলে সে শরীরে-মনে সেটা অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছিল।

রবি যেভাবে বলল এভাবে বললে অনেক কিছু নিয়েই মজা করা যায়। ব্যাপারটা এত কিছু নয়। কাল ধারাগিরিতে বেড়াতে গিয়ে দুপুরে একসময় রবি আর এলা জঙ্গলে একটা মস্ত গাছের তলায় ছায়ায় অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করেছিল। তারা যেখানে ছিল তার চেয়ে অনেকটা তফাতে পূর্ণেন্দুরা। আশেপাশে আরও দু-তিনটি পরিবার ধারাগিরি বেড়াতে গিয়ে যে যার মতন খাচ্ছেদাচ্ছে বিশ্রাম করছে। এলাদের কাছাকাছি কাউকে দেখা যাচ্ছিল না।

নানা রকম গল্প, হাসি-তামাশা করতে করতে একসময়—তেমন কিছুই না, রবি আকাশমুখো হয়ে শুয়ে থেকে থেকেই বলল, তার ঠোঁট ফেটে ভীষণ জ্বালা করছে; ব'লে রবি ফাটা ঠোঁটের পাতলা ছাল ছাড়াচ্ছিল। ওভাবে ফাটা ঠোঁটের ছাল তুলতে গেলে যা হয় —চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরিয়ে এল। রবি রুমাল দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। রক্ত বন্ধ হল, কিন্তু আশেপাশে জমা শুকনো রক্তের দাগ থেকে গেল। এলাকে বলল মুছিয়ে দিতে। এলা মুছিয়ে দিতে দিতে কী মনে করে যেন হেসে ফেলেছিল। আর রবি তখন হাত বাড়িয়ে এলার মুখ নামিয়ে নিয়ে চুমু খেয়ে ফেলল।

এলাও তখন বোধ হয় পাল্টা চুমু খেয়ে ফেলেছিল। মানে, তখন—ওই সময় ঠিক যে কী কী ঘটে গিয়েছিল, তা মনে পড়ছে না। দুজনে দুজনকেই চুমুটুমু খেয়ে হেসে ফেলল। তারপর গম্ভীর।

ঘটনাটা কাল ফেরার পথে এলাকে বার বার শিহরিত করেছে। রাত্রে নিশ্চয় এলা ওই নিয়ে অনেক ভাবত, ঘুমোতে পারত না।

কিন্তু সারাদিনের শারীরিক ক্লান্তির জন্যে সে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভোরবেলায় কথাটা মনে পড়েছে, অথচ সেই শিহরণ আসে নি। এখন বাজার যাবার পথে রবি এমনভাবে কথাটা মনে পড়িয়ে দিল যে এলার যা মনের তলায় তলায় বইছিল তা স্পষ্ট, প্রখর হয়ে উঠল।

এলার বরং কোথাও যেন খারাপই লাগছিল। ওসব কথার জায়গা কি হাটবাজার? কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই রবিদার।

বলতে কি, চুমু নিয়ে এলার ভীষণ কোনো ভাবনা নেই। এ রকম খাওয়াখাওয়ি আগেও হয়েছে দু-একবার। তবু কালকে যা হয়েছিল তার মধ্যে একটা নতুনত্ব ছিল। এলার ঠোঁটে রবির ফাটা ঠোঁটের রক্ত লেগে গিয়েছিল। রবি মুছে দিয়েছিল যদিও, তবু খুব হেসেছিল। বলেছিল—গোয়েন্দাগিরি করলে তুমি ধরা পড়ে যাবে, বী কেয়ারফুল।

ততক্ষণে ওরা বাজারে পৌঁছে গিয়েছে।

খানিকটা বেলা হয়ে গিয়েছে যে তা সত্যি, তবু লোকজনের কমতি কোথাও দেখা গেল না। রোজই আজকাল কিছু কিছু নতুন মুখ দেখা যায়, এক-আধদিনের মধ্যে এসে পৌঁচেছে, চেঞ্জারের দল। সবজির দোকানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ বাজার করছিল, সত্ত এসেছে, দেখলেই বোঝা যায় কলকাতার লোক।

রবি মাছ কিনছিল, এলা রাস্তার দিকে সরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন দেখছিল। সবজির দোকানে নজর পড়তে সে তাকিয়ে তাকিয়ে নতুন চেঞ্জারদের অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। ওই দলের একটি মেয়েকে তার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। এলার চেয়ে সামান্য বড়, মাথায় বেশ লম্বা, ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ, মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত, খোঁপা বা বিনুনি নেই, বব্ করা চুলের মতন দেখাচ্ছে, কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটির চোখে চশমা। এলা মনে করতে পারছিল না, ওকে কোথায় দেখেছে! খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল।

ওদের দলে জনা চার-পাঁচ। সেই রকমই মনে হচ্ছিল এলার।

একজন বেশ গিন্নিবান্নি ভারী গোছের চেহারার মহিলা, একটি বউ, এক ভদ্রলোক, আর সেই মেয়েটি। বাচ্চামতন ফ্রকপরা একটি মেয়েও সঙ্গে রয়েছে।

এলা বার বার তাকাল। একেবারে সরাসরি মেয়েটির মুখও দেখা যাচ্ছে না। একবার এলার মনে হল, তাদের হোস্টেল-পাড়ার কোনো মেয়ে হবে। পরে মনে হল, ওদের কলেজেরই কোনো মেয়ে হবে।

মাছ কিনে রবি ফিরে এল।

এলা বলল, "ওই মেয়েটাকে দেখছ—ওই যে, সিল্ক প্রিণ্ট শাড়ি পরে ··", চোখের এবং আঙুলের ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখাল এলা।

রবি মাথা নাড়ল। "কে ও?"

"মুখ চেনা, ঠিক মনে করতে পারছি না।"

"তোমার ফ্রেণ্ড্?" রবি ঠাট্টা করে বলল।

এলা মাথা নাড়ল। "ফ্রেণ্ড কেন হবে। চেনা-চেনা লাগছে।"

"চলো গিয়ে জিজ্ঞেস করা যাক।"

"হ্যাত্···", এলা মৃদু তিরস্কার করল।

রবি হাসতে হাসতে বলল, "আমাদেরও আলু বেগুন কপি কিনতে হবে, চলো সামনে গিয়ে দাঁড়াই।"

এলার সামান্য অনিচ্ছেই ছিল, কিন্তু রবি সোজা সবজির দোকানের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। এলা অল্প পিছনে।

দোকানে দাঁড়িয়েই মুখ দেখাদেখি হয়ে গেল। মেয়েটিও বেশ অবাক।

তারপর মেয়েটিই কথা বলল, "ওমা, তুমি?"

এলা বোকাসোকার মতন হাসল।

মেয়েটি খুশীর চোখে তাকিয়ে বলল, "বেড়াতে এসেছ?"

এলা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

মা এবং দাদা বউদির সঙ্গে এলার পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। মেয়েটির নাম লিলি। এলাদের কলেজ থেকে গত বছর বি-এ পাস করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।

এলার সব মনে পড়ে গিয়েছিল। সে যখন সদ্য কলেজে ঢুকেছে তখন লিলির কলেজ ছাড়ার অবস্থা। মস্ত একটা দল ছিল লিলির। এক পাল মেয়ে নিয়ে কলেজে চরে বেড়াত, নতুন মেয়েদের অপ্রস্তুতে ফেলত, তারপর হাসি-রগড় শেষ হলে ফুচকা কিংবা আলুকাব্‌লি খাওয়াত।

মা এবং দাদা বউদিকে মুদির দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে লিলি এলার সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

"আমরা কাল এসেছি—, দিন সাতেক থাকব। তোমরা কবে এসেছ?"

"অনেক দিন, পূজোর পর-পর।"

"থাকবে তো?"

"আমরা আর বেশিদিন থাকব না। দিদি মোটেই আর থাকতে চাইছে না।"

"কেন, জায়গাটা ভাল নয়?"

"কী জানি, আমি অত বুঝি না। খাইদাই, ঘুমোই, বেড়াই···। ভালই লাগে।"

রবি আলুটালু কিনতে কিনতে লিলিকে কয়েকবার দেখে নিয়েছে, এলাকেও গম্ভীর ভাবে বেগুন, কপি কিংবা কাঁচা টমাটোর কথা জিজ্ঞেস করেছে।

এলাকে সামান্য আড়ালে টেনে এনে লিলি জিজ্ঞেস করল, "সঙ্গের ভদ্রলোকটি কে?"

"আমাদের আত্মীয়। মানে দিদির। সম্পর্কে দেওর হয়।"

লিলি চাপা ঠোঁটে হাসল। "কি করে? বাজার সরকারী?"

এলাও হেসে ফেলল। বলল, "চাকরি করে, কলকব্জার ডিজাইনার না কী যেন।"

"দেখতে বেশ···না?" লিলি ইয়ার্কি করে হাসল।

এলা লজ্জা পেল। কেমন একটা গর্বও হল হঠাৎ।

লিলি বলল, "তবে তোমার চেয়ে বয়স বেশ বেশি। না?"

এলা বুঝল না লিলি এটা তামাশা করে বলল না সত্যিসত্যিই বলল। এলার তুলনায় রবির বয়েস সত্যিই বেশি। মনে কেমন একটা খুঁত ধরে গেল এলার। কথাটা তার আগেও যে মনে হত না তা নয়, তবে আগে কেউ এভাবে বলে নি।

লিলি কি মনে করে হাসতে হাসতে বলল, "কম বেশি বয়সে কিছু আসে যায় না। আসল ব্যাপারটা থাকলেই হল। কি বল ?"

লজ্জা পেয়ে এলা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। লিলি হাসছিল।

শেষে লিলি বলল, "আমি এবার যাই। আমার দাদা বাজার-হাট একেবারেই করতে পারে না, আর বউদি বড় খুঁতখুঁতে। আমি দু তরফের হয়ে সব সামলে দিই। যাই ভাই, তোমাদের বাড়ি একদিন যাব। কোনদিকে বাড়িটা ?"

এলা তাদের বাড়ির রাস্তাঘাট যতটা সম্ভব চিনিয়ে দিল।

লিলি বলল, "আমরা এসেছি ওই আশ্রমের দিকে। একদিন তোমাকে নিয়ে যাব।"

মাথা নাড়ল এলা।

লিলি যেতে যেতে বলল, "ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে আলাপ করব। ভালই তো !" বলে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে চলে গেল।

রবি বাজার শেষ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

খুচরো আরও কয়েকটা জিনিসপত্র কিনে রিকশায় উঠল ওরা। রোদের তেজ বেড়েছে।

রিকশায় বসে রবি বলল, "তোমার বন্ধু কি বলল ?"

এলা বলল, "কি আর বলবে, গল্প করছিল।"

"মেয়েটিকে দেখে মনে হল, খুব স্মার্ট।"

"ওরা যা ছিল কলেজে···বাব্বা !"

"আমায় ওভাবে দেখছিল কেন ?"

এলা বুঝল। হেসে বলল, "ভাল চেহারা দেখছিল···"

"ইস্ ! আগে জানলে দাড়িফাড়ি কামিয়ে পাউডার মেখে আসতাম।"

"তাতেও কিছু হত না···", এলা হাসল। "লিলিদি বলল তোমার বয়েস হয়ে গেছে।"

রবি যেন আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে গেছে, মাথায় হাত দিয়ে চুল ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল, "বলো কি! টাকফাক পড়ে গিয়েছে নাকি? চুল পেকেছে?"

এলার গায়ের পাশে রবির গা ঠেসাঠেসি হয়ে আছে। এলা সামান্য ঠেলা দিয়ে বলল, "বুড়ো হতে আর দেরি নেই।"

"মাই গড্! তা হলে—?"

"কি?"

"আমার কি হবে?"

"কিছু হবে না। এই রকম থাকতে হবে···"

রবি হেসে ফেলল। বলল, "সিরিআসলি একটা কথা বলছি তোমায়। বিয়েটা আমার ইমিডিয়েটলি করে ফেলা দরকার। থারটি আপ হয়ে গেছে। তোমার মতন নাবালিকাকে বোঝাতে পড়াতেই ফিফটি আপ হয়ে যাবে। তারপর অক্কা।"

এলা খুব নীচু গলায় ধমক দিল, "কি হচ্ছে, রিকশাবালা সব শুনছে।"

রবি হাসতে লাগল।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে রবি বলল, "পাবিদি আর পূর্ণেন্দুদার মধ্যে বয়সের কত তফাত?"

এলা ঘাড় ফিরিয়ে রবির দিকে তাকাল। "কেন?"

"জিজ্ঞেস করছি; তোমার হিসেবটা শুনি।"

"কত আর—! বেশি নয়।"

"বছর দুই তিন। তাও বোধ হয় নয়···"

"তুমি সব জানো! তিন তো হবেই।"

"তাই হোক। তিনই হোক। বয়স সমান সমান হলেই সুখী হয় লোকে—মানে স্বামী-স্ত্রীতে?"

এলা কথা বলল না।

রবি নিজে নিজেই আবার বলল, "শশধরদা আর বাসনাদি; তারাই বা কি ?"

সাংসারিক ব্যাপারে রবির জ্ঞান কিছু কম। এলার বোধ হয় কিছুটা বেশি। এলা বলল, "দিদি সুখী নয় তুমি জানলে কি করে ?"

প্রশ্নটা সাধারণ হলেও খানিকটা বেয়াড়া ধরনের। ইতস্তত করে রবি বলল, "সুখী মানে আমি একেবারে—একেবারে সব দিক থেকে মনের মিল, আনন্দ এসব বোঝাচ্ছিলাম। পাবিদি অসুখী বলি নি; কিন্তু ওদের দুজনের টেম্পারামেন্ট আলাদা।"

এলা বলল, "দিদি বরাবরই ভীষণ চাপা, ওপর থেকে তাকে কিছু বোঝা যায় না। সে সুখী না অসুখী ভগবান ছাড়া কারও বোঝার সাধ্য নেই। এখানে এসে দিদি কিন্তু আরও কেমন হয়ে গেল। হঠাৎ—!"

"সে অনেক ফ্যামিলি ব্যাপার আছে···তুমি বুঝবে না। বাড়ি, প্রপার্টি, শশধরদাদের ব্যাপার-স্যাপার···"

এলা বোধ হয় এসব তেমন মন দিয়ে শুনছিল না। বলল, "আমার আর এখানে ভাল লাগছে না। হোস্টেলে ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।"

রবি এলার মুখ দেখতে দেখতে বলল, "এখানে তোমার কিছুই ভাল লাগছে না ?" বলে হাসল।

এলা কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে পারল। ঠোঁটের কোণ দাঁতের ডগায় আস্তে করে কামড়ে থাকল একটু, তারপর চাপা হাসির চোখে চেয়ে বলল, "একটা জিনিস লাগছে একটু একটু।"

"জিনিসটা কি ?"

"তা বলব না।"

রবি জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল, "পাবিদিকে আমি বলব, তোমায় হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে। তুমি সেল্‌ফিশ হয়ে যাচ্ছ।"

"হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে এনে তারপর— ?"

"তারপর কি ? বিয়ের পিঁড়েতে বসিয়ে দিতে…"

"ঃঅত সস্তা—!"

দুজনের হাসিঠাট্টার মধ্যে রিকশাটা রেল-ক্রসিং পেরিয়ে গেল।

॥ দশ ॥

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির সামনে মাঠে পূর্ণেন্দু পায়চারি করছিল। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পার্বতী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণেন্দু কোনো কথা বলল না।

পার্বতী খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, আকাশ দেখল একটু, তারপর বলল, "তুমি কোথাও গেলে না ?"

"না।"

"ওরা কোন্ বাড়িতে বেড়াতে গেল যেন !"

রবি, এলা আর সন্তু গিয়েছে রবির আলাপী একজনের বাড়ি বেড়াতে। কাছাকাছি কোথাও।

পূর্ণেন্দু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল না, আস্তে আস্তে পায়চারি করছিল।

খানিকটা চুপচাপ থাকার পর পার্বতী বলল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার। ঘরে চলো।"

"এখানেই বলো।" পূর্ণেন্দু বলল।

পার্বতী আপত্তি করল না। অন্য সময় হলে হয়ত করত।

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শেষে পার্বতী বলল, "তুমি আমায় কিছু না বলে-কয়ে অনেক কাজ করো। কেন করো ?"

"ও-রকম আমি কিছু করি না। এক ব্যবসাপত্রর ব্যাপার…"

"তাই বা কেন করবে ?"

"বাঃ, তুমি মেয়েছেলে—, ব্যবসাপত্রের তুমি কি বুঝবে ?"

"ব্যবসাপত্রের আমি কিছু না বুঝলাম ; কিন্তু এই যে তুমি বাড়িটা খোয়াচ্ছ, এই কাজটা করার আগে আমায় জানাতে পারতে না ?"

"তখন না জানালেও পরে জেনেছ। আমার কপাল খারাপ, আটকে গেলাম।"

পার্বতী অপেক্ষা করল খানিক; বলল, "তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার বাড়িতে আমার স্বার্থ আছে বলে আমি হায়-হায় করছি তবে ভুল করেছ। আমি গরীবের ঘরে মানুষ, পাঁচ ভাড়াটের বাড়িতে এক-দেড়খানা ঘর নিয়ে থেকেছি। ছেঁড়া কাপড়, সেলাই করা জামা, কাচের চুড়ি পরে থাকতে আমার লজ্জা নেই; সেই ভাবেই আমি থেকেছি, তার চেয়েও কষ্টে। কিন্তু তুমি এভাবে থাকো নি। আমার জন্যে কিছু নয়, সন্তুর জন্যে আমি বলি। কি হবে সন্তুর ভবিষ্যতে?"

পূর্ণেন্দু কথা বলতে পারল না। কোনো কোনো ব্যাপারে পার্বতীর ওপর সে অসন্তুষ্ট ও বিরূপ হলেও পার্বতীর মনোভাব সে জানে। সন্তুর ভবিষ্যতের জন্যে পার্বতীর উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা যে কৃত্রিম পূর্ণেন্দু তা বলতে পারে না।

অসহায় বোধ করে পূর্ণেন্দু বলল, "আগে থেকেই তুমি ধরে নিচ্ছ বাড়িটা গিয়েছে। বাড়ি এখনও আমার।"

যুক্তিটা ছেলেমানুষের। পার্বতী বুঝল, পূর্ণেন্দু যা বলছে তা নিজেও বিশ্বাস করে না। তবু কথার কথা বলছে। পার্বতী বলল, "বেশ, তাই যদি হয় তাহলে ধারদেনার জন্যে তুমি এরকম কাহিল হয়ে পড়েছ কেন! শশধরবাবুদের ডেকে এনে তোমার কোনো মুশকিল আসান হচ্ছে?"

পূর্ণেন্দু কোনো আশাভরসা বাস্তবিকই পাচ্ছে না। বলল, "এত তাড়াতাড়ি কিছু হয় না।"

"তুমি এখনও আশা করছ কিছু হবে?" পার্বতী যেন ম্লান হাসল।

জোর করে কিছু বলতে পারল না পূর্ণেন্দু। বরং এখন তার হতাশা বোধ হল।

পার্বতী বলল, "আমার একটা কথা শোনো।"

"বলো।"

"শশধরবাবুদের ভরসা তুমি করো না। ওরা অন্য ধরনের মানুষ,

আমাদের মতন নয়।”

“ভরসা না হয় না করলাম, তারপর— ?”

“নিজে নিজেই যতটা পার করো,…”

“আমার টাকার সিন্দুক্ নেই।”

“না থাক। ব্যবসাপত্র বেচে দাও। যদি নিজে না পার অন্যে তোমায় দাঁড় করিয়ে দেবে না।” পার্বতী বলল মৃদু গলায়। “আমি তোমায় বলছি, সন্তুর মুখ চেয়ে বাড়িটা উদ্ধারের চেষ্টা করো।”

“তারপর ?”

“তারপর আর কি ? ও বাড়িতে এখন যা আছে তার ওপর আমরা ভাড়াটে বসাব। ভাড়ার টাকায় চলে যাবে।”

“ভাড়ার টাকায় কি সংসার তুমি চালিয়েছ এতদিন ?”

“ভাড়াটে আমাদের কম, তাতে চলে না। আরও বসালে চলবে। সংসার আমি চালাই। আমি বুঝব।”

পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে ছিল, কী মনে করে আবার পায়চারি শুরু করল।

পার্বতী দাঁড়িয়ে থাকল। আকাশ কালো, তারা ফুটে আছে। রেল লাইনের ওদিকে সিগন্যালের আলোটা জ্বলছে। সবুজ হয়ে গেছে। হয়ত কোনো গাড়ি আসবে।

পার্বতী নিশ্বাস ফেলে বলল, “তোমরা পার না, আমি পারি। আমি গরীব ছিলাম। গরীব ভাবে থাকতে পারব। আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার কিছু নেই। সবই তোমার, তোমাদের।”

পূর্ণেন্দু দাঁড়িয়ে পড়ে কথাগুলো শুনল। এভাবে কথা বলার দরকার কোথায় ? পার্বতী সাধারণত এ-রকম কিছু বললে উচ্চস্বরে রাগের মাথায় বলে, কোনো কিছু ভেবে নয়। হয় ক্রোধ না হয় অভিমান ছাড়া ‘আমার তোমার’ ধরনের কথাগুলো আসে না। কিন্তু এখন পার্বতী যেভাবে কথা বলছিল তাতে মনে হল, সে বিশেষ কোনো বেদনা ও দুঃখের সঙ্গে বলছে। পার্বতীর স্বভাব, পূর্ণেন্দু যতটা জানে, ওরকম নয়।

অবাক হচ্ছিল পূর্ণেন্দু। কি হয়েছে পার্বতীর? ঘাটশিলায় এসে বেশ তো ছিল প্রথম প্রথম; তারপর যে ওর কী হল কে জানে! শশধরদের ওপর পার্বতী যে খুশী নয় পূর্ণেন্দু জানত, তবে সে বোঝে নি পার্বতী ওদের ওপর মনেপ্রাণে এতটা বিরূপ। ঘাটশিলায় এসেও প্রথমটায় বাস্তবিকই বোঝা যায় নি পার্বতী শশধর-বাসনাকে এভাবে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। তখন তো পূর্ণেন্দু দেখেছে পার্বতী হাসিমুখেই সব মানিয়ে নিচ্ছে। মুশকিল হল সেদিনের রাত্রের ব্যাপার নিয়ে, হঠাৎ যেন পার্বতীর মাথা গোলমাল হয়ে গেল।

সংসারে এক ধরনের মানুষ থাকে যাদের স্বভাব নরম ধাতে বাঁধা। এদের কৌতূহল বা আগ্রহ কদাচিৎ তেমন তীব্র হয়। সাধারণত এদের ব্যক্তিত্ব উগ্র কিংবা প্রখর হয়ে প্রকাশও পায় না। পূর্ণেন্দুর স্বভাব অনেকটা এই রকমের। পার্বতীর কাছে বলে নয় সকলের কাছেই সে কেমন গুটিয়ে থাকে। বিশেষ করে অন্যের ব্যক্তিত্বে যদি আধিপত্যের ভাব থাকে পূর্ণেন্দু নিজেকে শামুকের মতন গুটিয়ে ফেলে, এই তার স্বভাব। বিয়ের পর থেকে সে পার্বতীর সব রকম কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে যে—এই সংসারের দায় পাবর্তীর, দায়িত্ব পার্বতীর, পূর্ণেন্দু সেখানে হাত বাড়াবে না।

পূর্ণেন্দুর একবারও সন্দেহ হল না, পার্বতীর এই পরিবর্তনের অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।

কাছাকাছি একটা বড় পাথর পড়ে ছিল। পূর্ণেন্দু এগিয়ে গিয়ে পাথরটার ওপর বসল। বসে সিগারেট ধরাল।

"অত ভাবনার কিছু নেই," পূর্ণেন্দু বলল, "কালকেই আমায় বাড়ি ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে না।"

পার্বতী সামান্য তফাতে ছিল, কথাটা শুনল।

পূর্ণেন্দু নিজের থেকেই বলল, "কপালে যা আছে হবে!"

কি মনে করে পার্বতী শুধলো, "তুমি কপাল বিশ্বাস করো?"

"খানিকটা করি। যা হবার হবে—এটা ভেবে নিলেই কপালে বিশ্বাস করা হয়।"

"আমি বিশ্বাস করি," পার্বতী বলল "একসময় করতাম না। এখন করি।"

পূর্ণেন্দু খানিকটা চুপ করে থেকে কিছু ভাবতে ভাবতে বলল, "আমি অনেকদিন থেকেই এটা বিশ্বাস করে ফেলেছি একরকম। আমাদের যখন ভাল সময়, বেশ ভাল সময়, বাবা মারা গেল হঠাৎ। সেটা সামলে উঠতে না উঠতে মা। মা বেঁচে থাকলে আমার জীবনটাই বদলে যেত।" পূর্ণেন্দু থামল, সিগারেট খেল খানিক, তারপর আবার বলল, "যমুনাও কেমন হঠাৎ মরে গেল। আশ্চর্য! আমার ভয় ছিল, বাচ্চা হতে গিয়ে একটা বিপদ না হয়, দুর্বল স্বাস্থ্য ছিল বলেই ভয় ছিল, একটু-আধটু গণ্ডগোলও ছিল। অথচ বাচ্চা হতে গিয়ে ও মরল না, মরল সন্তুকে বছরখানেকের করে। সবই কপাল ··"

পার্বতী এগিয়ে এসে পাথরের সামনে দাঁড়াল।

আরও কিছুক্ষণ সিগারেট খেয়ে পূর্ণেন্দু বলল, "বসো না।"

পার্বতী বসল।

বোধ হয় পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে কথার ঝোঁক এসেছিল পূর্ণেন্দুর। বলল, "তোমায় বিয়ে করে আমার একটা ভয় ছিল -, সে-ভয় আর আমার নেই।"

পার্বতী বুঝতে পারল, পূর্ণেন্দু কোন্ ভয়ের কথা বলছে। সন্তুর কথা। পার্বতী কোন্ চোখে সন্তুকে নেবে সেই ভয়।

পার্বতী বলল, "আমার নিজের কিছু হলে জানি না কি করতাম, তা যখন হল না, হবে না, তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।"

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিল পূর্ণেন্দু। "বলেছি তো আমার ও ব্যাপারে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।"

দুজনেই কেমন নীরব হয়ে গেল। নীরব অবস্থায় দুজনেই বোধ হয় অনুভব করল, তারা একভাবে কথা শুরু করেছিল, ক্রমশ একেবারে সাংসারিক কথার মধ্যে এসে পড়েছে। অনেকদিন যেন তারা এভাবে কথা বলে নি। অন্তত এমন করে নয়।

পার্বতী নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে; আচমকা শুধলো, "তুমি

আমায় কতটা বিশ্বাস করতে পার ?”

পূর্ণেন্দু সাদামাটা ভাবেই কথাটা নিল ; বলল, “কেন ? সবটাই।”

বুকের কোথাও যেন পার্বতী কেমন দুর্বলতা অনুভব করল, বলল, “তা হয় না।”

“হয় না ?”

“মানুষকে সবটা বিশ্বাস করা যায় না ”

“মানুষের কথা কে বলছে, আমি তোমার কথা বলছি। নিজের স্ত্রীকে বিশ্বাস না করার কোনো কারণ আমার নেই।”

পার্বতীর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, তুমি আমাকে শুধু তোমার স্ত্রী হিসেবেই দেখছ, অন্যভাবে দেখছ না। আমায় যদি মেয়ে হিসেবে দেখতে, আমার মন্দর কথা ভাবতে, তবে এ-কথা বলতে না। তুমি সাদাসিধে, বোকা, সরল মানুষ। এই সংসারের অন্য পিঠ তোমরা দেখতে শেখো নি।

পার্বতী বলল, “তোমার চোখ নেই। চোখের সামনে বাসনাদিদের দেখছ না ? বাসনাদি কেমন স্ত্রী তুমি বোঝ না ? শশধরবাবু তার স্ত্রী সম্পর্কে কি বলে তুমি শোনো নি ? সেদিনও তো শুনলে। স্ত্রী হলেই সে বিশ্বাসের লোক হবে এমন কোনো কথা নেই।”

পূর্ণেন্দু চুপ করে কথাটা শুনল। পরে বলল, “তোমারও চোখ তেমন নেই।”

“কেন ?”

“তুমি ওদের ঝগড়া, মারপিট, নোংরামিটাই দেখছ। ওদের সম্পর্কের আরও একটা দিক দেখছ না।”

অন্য দিক দেখার জন্যে পার্বতী তেমন আগ্রহ অনুভব করল না।

পূর্ণেন্দু বলল, “ওদের দেখলে মনে হবে এই ভাবে ম্যারেড্ লাইফ কাটানো যায় না। কাটানোর কোনো মানেও হয় না। দুটোই সমান। শশধরবাবু জানেন তাঁর স্ত্রীর চরিত্র কী। স্ত্রীও জানে স্বামী কেমন। কেউ কাউকে এ ব্যাপারে সম্মান-টম্মান করে না। তবু মজা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না।”

পার্বতী কোনো কথা বলল না।

যেন পার্বতীকে কিছু বোঝাচ্ছে এইভাবে পূর্ণেন্দু বলল, "এ-রকম ক্ষেত্রে কি হয়? ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। দু পক্ষেরই শান্তি। এদের কিন্তু সেটি হবার উপায় নেই, যাই করুক—কেউ কাউকে ছাড়বে না।"

পার্বতী বলল, "এটা ওদের ধরন।"

"হ্যাঁ, ধরন—" পূর্ণেন্দু মাথা নেড়ে স্বীকার করে বলল, "এই ওদের প্যাটার্ণ, এইভাবেই ওরা থাকবে, কুকুর-বেড়ালের মতন ঝগড়া করে।"

"তাতে লাভ কোথায়?"

"কে জানে! আমি বুঝতে পারি না। কিন্তু ভাবি। ভেবে দেখেছি, ওদের মধ্যে কোথাও একটা কিছু আছে। একজন অন্য-জনকে বোঝে—নয়ত এভাবে থাকতে পারত না।"

পার্বতী মুখ তুলে স্বামীকে দেখবার চেষ্টা করল। মানুষটা বরাবরই শান্ত, নির্বিরোধ, ঠাণ্ডা মাথা, খানিকটা বোকাও। কথাবার্তা যা বলে তা সাধারণ রকমের। পার্বতীকে ভয় পায়। পার্বতী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে যে ওকে অসহায় ভাব করে থাকতে হবে, ভয়ে ভয়ে চলতে হবে তা নয়; তবু পার্বতীর চড়া স্বভাবের কাছে পূর্ণেন্দু যেন প্রথম থেকেই বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে সাংসারিক অনর্থক বিরোধ এড়িয়ে গেছে। হয়ত পার্বতীর কর্তব্যপরায়ণতা, পূর্ণেন্দুর সন্তানের প্রতি পার্বতীর মমতা ইত্যাদির জন্যে পূর্ণেন্দু প্রথমাবধি কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধ ও দুর্বলতা নিয়ে স্ত্রীকে দেখে আসছে। এই মানুষ যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে আলাদা করে কিছু ভাবতে পারে পার্বতীর কোনো দিন মনে হয় নি। আজকের কথা শুনে পার্বতী অবাক হচ্ছিল; একেবারে বোকার মতন কথা তো বলছে না।

পার্বতী বলল, "বোঝাবুঝি জানি না, একটা জিনিস বলতে পারি, দুজনেই এই ভাবে থাকতে থাকতে একটা অভ্যেস করে নিয়েছে।"

"ভালই করেছে।"

"একে তুমি ভাল বলো?"

"বলব না কেন!...আমি দু-পাঁচটা আরও দেখেছি। স্বামী-স্ত্রীও অনেক দেখলুম আমার বন্ধুদের মধ্যে। হরেদরে সবই এক। আমাদের এক বন্ধু বছর পাঁচেক পরে তার বউকে ডিভোর্স করল। তার নাকি বনছিল না। তোমায় বলেছি তার কথা। নন্দকিশোর। ডিভোর্স করে থাকল কিছুদিন, আবার একটা বিয়ে করল, অফিসের একটা মেয়েকে। বিয়ের পর থেকেই লেগে আছে। এখন বলে ভাই আগেরটাই ভাল ছিল। তবু তার সঙ্গে বছর পাঁচেক থাকতে পেরেছি, এর সঙ্গে দু' মাসেই ফেড্ আপ!" বলে পূর্ণেন্দু হাসল একটু।

পার্বতীর ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করে, এত জ্ঞানের কথা তো বলছ, কিন্তু কাল যদি তুমি শোনো, মহীপতির সঙ্গে আমার লুকিয়ে বিয়ে হয়েছিল, আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতন থেকেছি-- কথাটার মানে নিশ্চয় বুঝেছ—, তারপর মহীপতি পালাল, আমি মুখ বুজে কুমারী সেজে থাকলাম, থাকতে থাকতে তোমার সঙ্গে আলাপ হল, সুযোগ সুবিধে বুঝে তোমায় বিয়ে করে ফেললাম--যদি এ-সব শোনো তাহলে তোমার অবস্থা কেমন হবে? এই স্ত্রী কি তোমার পছন্দসই হবে? রাখতে পারবে আমাকে? তোমার নরমসরম স্বভাব, গোবেচারী ভাব, শিষ্টতা তখন আর থাকবে না। যে তুমি আমার কাছে পোষমানা হয়ে আছ, সেই তুমিই তখন দাঁতনোখ বের করে চোখ লাল করে আমায় শাসাবে।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। হঠাৎ বলল, "এক স্বামী ছেড়ে এসেছে—কিংবা ধরো বিয়ে করে ভেঙে গেছে, আবার বিয়ে-থা করল—এমন মেয়ে দেখেছ?"

পূর্ণেন্দু ভাবল। বলল, "আজকাল ডিভোর্সের পর আবার অনেক মেয়ে বিয়ে করছে। ছেলেও। কেন?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি। তারা কেমন থাকে কে জানে?"

"ভালই—", পূর্ণেন্দু বলল, "মানিয়ে নিয়ে থাকতে পারলেই ভাল থাকে, মানাতে না পারলে থাকে না।"

পার্বতীর মনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। কথাটা বলার পর সে বুঝল,

দুয়ের মধ্যে তফাত আছে—বিবাহবন্ধন ছিন্ন করে আইনসঙ্গত এবং সামাজিক ভাবে যে আসছে তার কোনো গোপনীয়তা নেই, সে তার অতীত লুকিয়ে রেখে আসছে না। পার্বতীর বেলায় তা নয়। পার্বতীর অতীত পূর্ণেন্দু জানছে না, জেনে বিয়ে করে নি। আজ আচমকা জানতে পারলে পার্বতীকে সে ভাল চোখে নিতে পারবে না।

ভাল লাগছিল না পার্বতীর। প্রসঙ্গটা পালটে ফেলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

"চলো ঘরে যাই, খুব অন্ধকার লাগছে।" পার্বতী বলল।

পূর্ণেন্দু বলল, "চলো।"

দুজনেই উঠল।

পার্বতী বলল, "শশধরবাবু সম্পর্কে কি করবে ভেবে দেখো।"

"দেখব।"

"আমার তো মনে হয়, তুমি ওকে যে ভাবে ধরে আছ তার কিছু হবে না।"

"ভরসা পাচ্ছি না।...আমি কিন্তু তোমায় বলছি, শশধর লোকটা খারাপ নয়। ওর মন ভাল।"

"কী জানি, আমার ভাল লাগে না।" হাঁটতে হাঁটতে পার্বতী বলল, "ও নিজে কিছু করে না, অন্যকে চালিয়ে যায়।"

"একদম করে না যে তা নয়, কিছু করে...। সে যাকগে, তোমার যখন এতই আপত্তি ভেবে দেখেছি বাড়িতে অশান্তি করে লাভ নেই; আমি অন্য চেষ্টা করব।"

পার্বতী আর কিছু বলল না।

বাড়ির বারান্দায় উঠে পার্বতী হঠাৎ বলল, "এখন ক'টা বাজে?"

পূর্ণেন্দুর হাতে ঘড়ি ছিল না। আন্দাজে বলল, "সাড়ে সাত-টাত হবে।"

"সন্তুরা ফিরবে কখন?"

এত তাড়াতাড়ি কি ফিরবে?"

নিজের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে দিয়ে পার্বতী একটু দাঁড়াল।

ঘরের বাতি জ্বালল না। তারপর পূর্ণেন্দুকে ডাকল, "এ ঘরে এস না।"

পূর্ণেন্দু ঘরে আসতে ঘরের আলো জ্বেলে দরজাটা সামান্য ভেজিয়ে দিল পার্বতী।

॥ এগারো ॥

মহীপতি বারান্দায় বসে ছিল। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বারান্দায় এসে বসেছে। সিগারেটটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, বাকিটুকু শেষ হলে উঠে পড়বে। বারান্দা অন্ধকার, বাগান কালো হয়ে আছে, বকুলগাছের মাথা পর্যন্ত চোখ যায়, তারপর আর দৃষ্টি যায় না। বাগানের গাছপাতায় হিম পড়ছে; সামনে শীত; আসন্ন শীতের বাতাসও আজকাল গায়ে লাগে।

আলস্য এবং ক্লান্তি লাগছিল মহীপতির। আজ সারাদিন কাজে কাজে গেছে। সকালে গিয়েছিল জঙ্গলের ইজারার জন্যে। নতুন একটা ইজারা নেবার ইচ্ছে। কাঠগোলা আরও বাড়াবে, করাত-কল বসাবে—এই সব চিন্তায় এবং কাজে মহীপতি আজ ক'দিন খুব ব্যস্ত। মাঝে মাঝে যখন ক্লান্তি আসে, আলস্য জড়িয়ে ধরে গভীর করে তখন মহীপতির মনে হয়, সে অকারণে এত বেশি করে ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। এর কোনো দরকার বাস্তবিকই ছিল না। তার যা আছে এই যথেষ্ট: মাথা গোঁজার মতন একটা জায়গা এতদিনে করে নিতে পেরেছে, কাঠগোলার যে ব্যবসা নিয়ে এখানে পড়ে ছিল তাতে তার খাওয়াপরার অভাব হবার কথা নয়। একেবারে শূন্য হাতে সে বসেও নেই। এই ভাবেই তার চলে যেতে পারত। কেন যে নতুন করে আবার এক ব্যবসায় নামছে, বা যা ছিল তা বাড়াতে চাইছে—মহীপতি নিজেও যেন সেটা স্পষ্ট বোঝে না। একজন অংশীদার জুটেছে এটা বড় কথা নয়। মহীপতির এ বিষয়ে আগ্রহও তেমন ছিল না, বরং অংশীদার অর্জুনবাবুর আগ্রহই বেশি। হয় অর্জুনবাবুর

আগ্রহাতিশয্যে, না হয় অন্য কোনো কারণে মহীপতি তার কারবার বাড়াতে, ফাঁপাতে চাইছে। অন্য এই কারণটা যে কী মহীপতি বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে, এ যেন নিজেকে আরও জড়িয়ে রাখার চেষ্টা, কাজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখার ইচ্ছে।

সিগারেটটা মহীপতি ফেলে দিয়েছিল। অন্ধকার বারান্দায় পায়ের শব্দ পেয়েও মহীপতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না।

রমা পায়ের শব্দ করে কাছে এল। এসে বলল, "ঘরে সাপ ঢুকেছে।"

মহীপতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। "সাপ ঃ কোথায় ?"

"আমার ঘরে।"

সাপের কথায় যতটা চমকাবার কথা এরা কেউই অতটা চমকালো না। গাছপালা, ঝোপজঙ্গল মাঠেঘাটে থাকতে থাকতে এই অভ্যেসটা হয়ে গেছে।

মহীপতি বলল, "সে কী রে! তাড়াতে বলেছিস ? মারতে বলে দে···", বলতে বলতে মহীপতি উঠে দাঁড়াল।

রমার ঘরে সাপ, অথচ তার গরজ যেন কম। দাঁড়িয়ে থাকল।

মহীপতি বলল, "চল, দেখি।"

রমা বলল, "বিষনদা দেখেছে। পাচ্ছে না।"

বিষন এ বাড়ির চাকর, মাঝবয়সী লোক, কাজেকর্মে পটু, বিশ্বস্ত। মহীপতি বুঝতে পারল না ঘরে যদি সাপ ঢুকে থাকে তবে না দেখতে পাবার কারণ কি ?

মহীপতি বলল, "আচ্ছা চল, আমি দেখছি।"

রমার ঘরে এসে মহীপতি দেখল বিষন তখনও সাপ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে। চারপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সে কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

মহীপতি নিজেও খাটের তলা, চৌকাটের ফাঁক, এ-কোণ ও-কোণ দেখতে লাগল।

হাল ছেড়ে দিয়ে বিষণ বলল, "ঘরে সাপ নেই, ঢুকে থাকলেও

বেরিয়ে গেছে, নালি নর্দমার মুখ বন্ধ।"

বিষন তার হাতের লাঠিটা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

মহীপতি বলল, "কোথায় সাপ?"

রমা নির্বিকার ভাবে বলল, "আছে।"

"কোথায় আছে? সবই তো ও দেখল। সাপ থাকলে দেখতে পেত না?"

রমার চোখমুখ বলছিল: সাপ তোমরা দেখ না দেখ সাপ আছে।

মেয়েটার মাঝে মাঝে ঝোঁক ধরে, ছেলেমানুষির মতন ঝোঁক কিংবা জেদ। মহীপতির মনে হল, ঠিক সেরকম কোনো ঝোঁক না হলেও ওর যেন কেমন একটা জেদ চেপেছে।

"তুই সাপ দেখেছিস?" মহীপতি জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"তবে?"

রমা নাক টানল, যেন বাতাসের গন্ধ শুঁকল, তারপর শাড়ির আঁচলে নাক চাপা দিয়ে বলল, "গন্ধ।"

মহীপতি বিরক্ত হয়েও হেসে ফেলল। "সাপের গন্ধ পাচ্ছিস তুই?"

রমা মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ—সে গন্ধ পাচ্ছে।

মহীপতি আর বলার মতন কথা খুঁজে পেল না। যে সাপ দেখে না, অথচ সাপের গায়ের গন্ধ পায় তাকে কীই বা বলা যায় আর।

"তোর বলিহারি নাক।···ঘরে সাপটাপ নেই, তুই শুয়ে পড়।" মহীপতি বলল, বলার পরও এপাশ ওপাশ ভাল করে দেখতে লাগল।

রমা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। সে এঘরে শোবে না। বলল, "সাপের গন্ধ, সাপ আছে। আমি শোব না।"

"কোথায় সাপ! সাপ নেই।"

"আছে।"

"তোর মাথা আছে।···" মহীপতি ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল। "থাকলে থাকুক তোকে কিছু বলবে না।"

মহীপতির সঙ্গে সঙ্গে রমাও ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

"কি হল ?"

"আমি শোব না। সাপের গন্ধ।"

"কী জ্বালা ! তুই ঘরে শুবি না তো কোথায় শুবি ?"

রমা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে মহীপতির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল।

মহীপতি বিরক্ত হচ্ছিল। সাপ নেই, তবু বলবে আছে। চোখে দেখে নি—গন্ধ শুঁকেই সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। সাপ বেরোবার সময়ও এটা নয়। বর্ষাকালে এরকম অবশ্য হয়; বাড়ির মধ্যে সাপখোপ চোখে পড়ে। এখন শীত এসে গেছে। শীতের এই সময় সাপ নজরে পড়ার কথা নয়। আসলে মেয়েটার মাথা খারাপ, কোথাও কিছু দেখে নি, হয়ত কোথাও কিছু গন্ধ পেয়েছে, তার মনে হয়েছে সাপ। সাপের আবার গন্ধ থাকে নাকি ! কে জানে ! মহীপতি জানে না।

বারান্দা দিয়ে নিজের ঘরে আসতে আসতে মহীপতি দেখল, রমা তার শোবার ঘরের চৌকাট ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকছে।

ঘরে এসে মহীপতি বলল, "তুই এঘরে চলে এলি যে ?"

রমা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। বলল, "ও ঘরে আমি শোব না।"

"কেন শুবি না ? সাপ নেই বলছি না তোকে ?"

"আছে।"

"সাপের গায়ের গন্ধ থাকে নাকি ? জন্তু কোথাকার !"

"থাকে।"

মহীপতি মুশকিলে পড়ল। "বেশ, তুই শুবি কোথায় ?"

রমা নিরুত্তর।

"এ ঘরে শুবি ?"

রমা পলকের জন্যে মহীপতির মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল।

মহীপতি বুঝতে পারল, রমা এ ঘরে তার কাছে শুতে চায়। মহীপতি অবাক হল না, আশ্চর্য বোধ করল না। আজকাল, অন্তত

বছরখানেক ধরে রমার কোনো কোনো পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ে। ইদানীং তা আরও স্পষ্ট খোলামেলা হয়ে উঠেছে। অনেক দিন ধরেই মহীপতি দেখছে রমা যেন তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। কী বোঝাতে চাইছে মহীপতি তা জানে।

রমার দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থাকল মহীপতি। তাদের সম্পর্ক এতকাল বিশেষ জটিল ছিল না। রমা ছিল আশ্রিতা, মহীপতি তাকে পালন করেছে। স্নেহ, মমতা, করুণা ছাড়া বিশেষভাবে অন্য কিছু অনুভবও করে নি। এখনও সে এর বেশি আর যে কী অনুভব করে তা জানে না।

অথচ মহীপতি লক্ষ্য করেছে, রমার ইদানীং এক-একটা মুহূর্ত আসে যখন সে মহীপতিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে, গায়ের কাছে এসে ঘন হয়ে দাঁড়ায়, নোখ দিয়ে খামচায়, আঁচড়ে দেয়, দু-একবার আচমকা ধারালো দাঁতে কামড়েও দিয়েছে। প্রায় নির্বোধ পশুর মতন তার উত্তেজনা ব্যক্ত হয়। মহীপতি এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো প্রশ্রয় রমাকে দেয় নি, তবু কখনও-সখনও যতটা সম্ভব হালকা করে হলেও মেয়েটার মতিগতি নরম করার জন্যে হয় হেসে ঠাট্টা করে কিছু বলেছে, বুঝিয়েছে, না হয় খানিকটা আদর করে সরিয়ে দিয়েছে।

আজ রমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কতটা কী করা যায় মহীপতি ভাবতে লাগল।

রমা দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঘাড় একপাশে ঘোরানো। লম্বা, সরু ঘাড় বলে তার এই বাঁকানো ঘাড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘাড়ের দুপাশে চুলের গুচ্ছ, মাথায় জড়ানো খোঁপা। গায়ের শাড়িটা ডুরে, সবুজ আর খয়েরী লালের; এখনও যেন পুরো কোর ওঠে নি। মহীপতি রমার হাত দেখতে পাচ্ছিল: একটা হাত নীচে পাশাপাশি ঝোলানো, অন্য হাত কাঁধের দিকে আড়াল পড়েছে। রমার হাত লম্বাটে, তেমন পুষ্ট নয়, অথচ মোলায়েম ও নিজের ছাঁদ মতন। গায়ের জামাটা রঙীন নয়, সাদা।

মহীপতি বলল, "তুই এ ঘরে কোথায় শুবি? নীচে?" বলে

মহীপতি ইচ্ছে করেই হাসল।

রমা ঘাড় ফিরিয়ে মহীপতির দিকে তাকাল।

মহীপতি রমার চোখ দেখল। ওই চোখ থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। রহস্য অথবা সঙ্কোচ রমার চোখে ছিল না। তবু মহীপতির মনে হল, চোখ যেন সামান্য ঘোলাটে।

"কোথায় শুবি তুই? নীচে শুলে তোকে পোকামাকড়ে কামড়াবে। আমার আর মশারি নেই।" মহীপতি ঠাট্টা করছিল যেন।

রমা বলল, "কামড়াক।"

"তোর ঘর থেকে সাপটা এ ঘরেও চলে আসতে পারে।"

"না।" রমা মাথা নাড়ল।

"কি করে বুঝলি তুই? তোকে না পেয়ে এঘরে এসে হাজির হবে ঠিক।"

"আমি খাটে শোব।"

"বাঃ, আর আমি?"

রমা চোখের ইশারায় বিছানা দেখাল যেন।

মহীপতি ইচ্ছে করেই হাসল। বলল, "তুই আমার সঙ্গে বিছানায় শুবি কি রে? তুই আমার কে?"

রমা তেমন কোনো গা করল না, বিছানায় গিয়ে বসে পড়ল।

মহীপতি এবার সন্ত্রস্ত হল। রমাকে এঘর থেকে সরানো মুশকিল। সাপের ব্যাপারটা রমার চালাকি হতে পারে। এসব বুদ্ধি রমার থাকার কথা নয়। কিন্তু ক্রমেই হয়ে উঠছে। বোধ হয়, মানুষের কোনো কোনো জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে আসে।

মহীপতি একবার ভাবল, সে খানিকটা শক্ত হবে কিনা। কখনো-সখনো তাকে শক্ত, রুক্ষ হতে হয়; শাসন করতে হয় রমাকে। এক সময়, রমা যখন কিশোরী ছিল, মহীপতি দু-একটা চড়চাপড়ও লাগিয়েছে, রমার বয়স বাড়ার পর এখন আর ঠিক সেভাবে গায়ে হাত তুলতে পারে না। ধমকধামক দিয়েই শাসন করে। মহীপতিকে

রমা ভয়ও পায়। আজ, এই অবস্থায় মহীপতি রমাকে ভর্ৎসনা করতে বা তার ওপর রুক্ষ হতে সাহস হল না। তাতে বিপরীত হতে পারে

রমা যে আগের অবস্থায় আর নেই, পূর্বের মতন ব্যবহারও যে তার প্রতি করা যায় না মহীপতি জানে। বিশেষ করে, এখনকার রমা অন্য মানুষ, তার সঙ্গে সাধারণ মেয়ের পার্থক্য খুব বেশি নয়।

মহীপতি ভাবল সামান্য, বলল, "আমার বিছানায় তোকে শুতে নেই।"

রমা হাসল। তার হাসি বিচিত্র। চতুরের মতন সে হাসতে পারে না, হয় নির্বোধের মতন হাসে, না হয় সরল ভাবে। এ হাসি নির্বোধের নয়। হয়ত সরল, কিন্তু কিছুটা কৌতুক রয়েছে।

রমার হাসি দেখতে দেখতে মহীপতি হেসে বলল, "আমার বউ হলে শুতে পারতিস।"

রমা চোখ বাঁকা করে মহীপতিকে দেখল। বলল, "আমি কে?"

"তুই বল---তুই কে!"

"পুষ্যি।"

মহীপতি জোর করে হাসল। বলল, "আমি তোর বিয়ে দেব দেখবি। জোয়ান ছেলে। কাজ-কর্ম করে। তোকে বিয়েতে অনেক জিনিস দেব, শাড়ি গয়না খাট···", মহীপতি যেন ছেলে ভোলানোর মতন করে বলছিল, অথচ সে জানে রমার বিয়েতে এর বেশি দিতেও তার আপত্তি নেই।

বিয়ের লোভ রমাকে বিচলিত করতে পারল না। মস্ত করে হাই তুলল। হাই তোলার সময় গা ভেঙে বসে মুখে হাত ওঠাল। এবার যেন সে শুয়ে পড়বে বিছানায়।

মহীপতি বুঝতে পারল না, সে কী করবে। রমা যদি শুয়েই পড়ে তাকে ঠেলে উঠিয়ে দিতে পারবে না, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

মেয়েটার আজ রোখ বেশি। শুধু রোখ নয়, বোধ হয় মহীপতিকে

অবজ্ঞা করতেও চাইছে। এ-রকম হবার কথা নয়। কেন হচ্ছে—তাও মহীপতি অনুমান করতে পারছিল না।

বিছানার দিকে এগিয়ে এসে মহীপতি বলল, "আমার পাশে কেউ শুলে আমার ঘুম হয় না।…তুই তবে বিছানায় শো, আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি।" বলে মহীপতি এমন একটা ভঙ্গি করে দাঁড়াল যেন সে তার বালিশ-টালিশ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

রমা মহীপতির চোখের দিকে তাকাল। তাকে অসন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল।

মহীপতি ঠাট্টার গলায় বলল, "তোর শোওয়া খারাপ। তুই একেবারে জংলী, তোর মুখে যত আতাটাতা পেয়ারার গন্ধ।"

মহীপতির কথা শেষ হবার আগেই রমা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহীপতির মাথার বালিশ আঁকড়ে ধরল।

বিরক্ত হচ্ছিল মহীপতি। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে। দাঁতের গোড়ায় একটা ব্যথার মতন লাগছিল ক'দিন ধরেই, সেই ব্যথাটা আবার অনুভব করল হঠাৎ।

মহীপতি আরও একটু এগিয়ে রমার হাতের পাশ দিয়ে বালিশ ধরে টানতে গেল।

রমা ছাড়ল না।

মহীপতি রমার কাঁধ ধরে টেনে তুলতে গিয়ে লক্ষ্য করল, রমার ঘাড়ের তলায় কালচে মতন দাগ হয়ে আছে। চুলের গুচ্ছ ওটা নয়, পাতলা লোমও নয়, কালশিরে বলেও মনে হল না। গাছের পাতার মতন, নাকি শ্যাওলার মতন দেখাচ্ছিল। দাগটা দেখতে দেখতে মহীপতির কী রকম মনে হল।

"এটা কিসের দাগ রে?" মহীপতি দাগটার কাছে আঙুল ছুঁইয়ে শুধলো।

রমা মুখ উপুড় করে শুয়ে ছিল বালিশ আঁকড়ে। কোনো জবাব দিল না।

মহীপতি দাগটার ওপর আঙুল বোলাতে বোলাতে আবার বলল,

"কোথায় লাগিয়েছিস ?"

রমা চুপচাপ, যেন সাড়া দেবার প্রয়োজন তার নেই।

মহীপতি বিছানায় বসল। বিছানায় বসে পিঠ নোয়াতে সে রমার সর্বাঙ্গে এক ঘ্রাণ অনুভব করল। প্রথমে না হলেও কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মহীপতি নিঃসন্দেহ হল, এই গন্ধ রমার শরীরের, তার বসনের। অর্ধ-পরিণত যৌবনের এই ঘ্রাণ মনোরম। মহীপতি কিছুটা আবেশ অনুভব করছিল। রমার ঘাড়ের কাছে সেই শ্যাওলা রঙের দাগের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে মহীপতি কেমন যেন অবাক হল। এই ঘ্রাণ তার পরিচিত মনে হচ্ছে। অনেক আগে সে প্রায় এই রকমের এক আবেশ অনুভব করেছিল। পার্বতী— পার্বতীর সর্বাঙ্গে একদা এই গন্ধ ও স্বাদ ছিল। মহীপতি তা নিবিড় করে উপভোগ করেছে। রমার ক্ষেত্রে মহীপতি সেই রকম, সেই একই ধরনের আসক্তি অনুভব করতে পারে না, অথচ সে যে আসক্ত হতে পারে তাও সত্য।

মহীপতি মাথা আরও নুইয়ে রমার ঘাড় ও চুলে কোমল করে হাত ছুঁইয়ে রাখল।

"রমা !"

রমা সাড়া না দিলেও শব্দ করল একরকম।

মহীপতি বলল, "তোর আবার জ্বর হবে। গা গরমগরম লাগছে। কাঁপুনি লাগছে নাকি ?"

রমা বালিশে মুখ গুঁজেই মাথা ঘষল, না।

"আমি দেখছি তোর গা গরম, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।" মহীপতি ইচ্ছে করেই বলল, অবশ্য রমার শরীর উষ্ণ ছিল, শরীরে কিছু রোমাঞ্চ ছিল। "তুই বরং এখানেই শো, এই বিছানায়, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি।"

মহীপতি উঠে পড়তে যাচ্ছে বুঝে রমা বিছানায় উঠে বসল। উঠে বসেই মহীপতির জামা ধরে ফেলল মুঠোয়।

মহীপতি মুঠো ছাড়ালো না, বলল, "তোর নির্ঘাত জ্বর হবে।"

"হোক।"

"জ্বরে তুই মরবি।"

রমা মাথা নাড়ল জোরে জোরে, সে মরবে না।

"তুই মরলে তোর বাবা স্বর্গ থেকে আমায় কি বলবে রে? এঁ্যা—! বলবে, হাবাগোবা মেয়েটাকে দিয়ে এলাম, মেরে ফেললে!"

মহীপতি কী ভাবে বলে ছিল রমা বুঝল না, বাবার কথায় আচমকা তার কী রকম শিথিলতা এল। যেন সে বাবাকে ভাবছে—বাবার স্মৃতি দেখছে এই ভাবে খানিক বসে থাকল। তারপর মহীপতির জামা ছেড়ে দিল। দিয়ে বার কয়েক মহীপতির দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাল। তারপর খানিকটা উদাস, খানিকটা ভয়ের চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল। তার বাবা যেন জানলার ওপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

মহীপতি উঠে দাঁড়াল।

সামান্য চুপচাপ, শেষে রমা মন-ভেঙে-যাওয়া হতাশ গলায় বলল, "আমি নদীতে চান করতে যাব।"

"নদীতে? তোর মাথা খারাপ?"

"কাল সকালে যাব।"

"বাড়িতে কুয়া নেই?"

"নদীর জলে ময়লা যায়। বাবা বলত—নদী, বালি, আকাশ ময়লা কেটে দেয়।"

মহীপতি কিছু বুঝল না।

রমা তার গায়ের শাড়ি না গুছিয়েই উঠে দাঁড়াল। তারপর কোনো কিছু না বলে, অনেকটা বেহুঁশের মতন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মহীপতি নির্বোধের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

॥ বারো ॥

দিন তিন চার আরও কেটে গেল। শশধররা টাটানগর থেকে ফিরে এল ট্যাক্সি করে। ডান হাতটা ভেঙ্গেছে শশধর, কব্জির কাছে, তবে মারাত্মক হয়ত নয়, হাত প্লাস্টার করা, গলার সঙ্গে বাঁধা কাপড়ে হাত ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। শশধর বলছে, হোটেলের বাথরুমে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে। বাসনা বলছে, মোটেই নয়, বুড়ো বয়সে কোথায় সিঁড়ি চড়তে গিয়ে পড়ে গিয়ে ভেঙেছে। পার্বতীর সন্দেহ, দুটোই মিথ্যে কথা, নিশ্চয় কর্তাগিন্নী মদ্যপ অবস্থায় লাঠালাঠি করার সময় এই অঘটন ঘটিয়েছে।

শশধর হাত ভেঙে এসেছে অবশ্য, কিন্তু থাকবে না এখানে, কালই কলকাতায় ফিরবে। বাসনা এসেই জিনিসপত্র গোছগাছ করতে বসল। যাবার সময় যে আবহাওয়ায় তারা গিয়েছিল এবং যে মনোভাব নিয়ে ফিরে এসেছে তার স্পষ্ট কোনো প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ছিল না। বরং শশধর এবং বাসনা এমন একটা ভাব দেখাচ্ছিল যেন পুরোনো ব্যাপারটা তারা ভুলে গেছে। মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে নিশ্চয় ওটা ভুলে যাবার ব্যাপার নয়। তবে সপ্তাহখানেকের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে কিছু জল গড়িয়ে গেছে, সেই সদ্য-সদ্য ভাবটা নেই, মানসিক উত্তেজনা বা পীড়নও অনেকটা থিতিয়ে এসেছিল। এই সব কারণে ওরা ফিরে এলেও এ বাড়ির থমথমে ভাবটা আর ফিরল না।

এ বাড়িতে এখন যা, তা নির্জীব, নিঃসাড় ভাব। ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা। আর এই ঝিমুনির মধ্যে ফলের কোয়া খুলে যাবার মতন মানুষগুলি সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। রবি আর এলা তবু মাঝে-সাঝে আড়ালে একটা জীবন্ত ভাব আনে, কিন্তু বাড়িটা নিশ্চয় আর জীবন্ত নয়।

শশধররা ফিরে এলে পার্বতী আর কোনো রকম অশান্তি করল

না। করার কারণও নেই। কথা ছিল তারা আসবে এবং এসে একটা রাত কাটিয়ে কলকাতায় ফিরবে। কথার খেলাপ তারা করছে না। কালই কলকাতা ফিরবে। বরং পার্বতী শশধরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলল, বাসনার সঙ্গেও বাক্যালাপ করল।

পূর্ণেন্দু বলছিল, ঘাটশিলা আর তার ভাল লাগছে না, তারাও ফিরে গেলে পারে।

পার্বতীর আপত্তি, চলো বললেই যাওয়া যায় না, গোছগাছ করে যেতে হলে দু-একটা দিন সময় চাই।

রবি বলছিল, আর দুটো দিন কাটানো মানেই দেওয়ালী। দেওয়ালীতেই তাদের ফেরার কথা।

অতএব সময় মতই ফেরা হবে।

•

দুপুরের খাওয়ার সময় শশধর প্রস্তাব করল, "চলো আজ বিকেলে কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি সবাই, আবার একসঙ্গে কোথায় যাব না যাব। লেট্ আস্ মেক্ এ হ্যাপি ইভ্নিং টুগেদার।"

রবি বলল, "আমি এগ্রি করছি। যাবেন কোথায়?"

এলা বলল, "ফুলডুঙ্রি।"

বাসনা বলল, "ডুঙ্রি না টুঙ্রি আমি আজও বুঝলাম না। এক-একজন এক-একরকম বলে।"

ফুলডুঙ্রি কাছেই। এ বাড়ি থেকে ধীরেসুস্থে হেঁটে গেলেও বোধ হয় পুরো আধ ঘণ্টা লাগে না।

চলো চলো করে বেরোতে বিকেল গড়িয়ে গেল। বিকেল আর এখন থাকে কোথায়, দেখতে দেখতে ফুরোয়, ঝাপসা হয়ে আসে। রোদ যখন গাছের মাথায় উঠে যাই-যাই করছে তখন ওরা বেরোলো। মহীপতিও এসে হাজির। এসেছিল অন্য কাজে, কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে, এদের মধ্যে আটকে পড়ল।

শশধর বলল, "চলুন মশাই, আপনার কাজ চিরকাল থাকবে,

আমরা থাকব না।”

মহীপতি কি ভেবে বলল, “চলুন।…হাতে কি হল ?”

“পতন।” শশধর হেসে জবাব দিল।

“টাটানগর থেকে ফিরলেন কবে ?”

“আজ।”

মহীপতি লক্ষ্য করে দেখল, এই দলটি অনেক দিন পরে জোড়া লেগেছে। যদিও সেই আগের মতন নয়, তবু জোড়া। আগে দেখে মনে হয়েছিল মৌচাক, এখন জোড়াতালি। তবু ভাল।

বাঁ-হাতি স্কুল, একটা দল এসেছে কলকাতা থেকে কাচ্চা-বাচ্চার, পতাকা উড়ছে, মাঠের মধ্যে গান গেয়ে গোল হয়ে নাচছিল বাচ্চা মেয়েরা, ছেলেগুলো ফৌজী কায়দায় প্যারেড্ করছে, বাঁশি বাজছে কোথাও। কলকাতার একজোড়া দিদিমণি গলা জড়াজড়ি করে প্রাণের গল্প করছে মাঠে বসে।

পিচের রাস্তা, পরিষ্কার। সামনে ক্রমেই চড়াই উঠেছে। রবি মাঝে মাঝে এলাকে গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছে, এটা কি গাছ ? ওটা কি গাছ বলো তো ? এলা বলতে পারছে না, বা বললেও ভুল বলছে। কাঁঠাল আর ডুমুর গাছের তফাত তার তেমন চোখে পড়ছে না ; ওই নিয়ে হাসা-হাসি, ঠাট্টা রগড় চলছিল।

এলা আজ পরিপাটি করে সেজেছে, ঘন সবুজ রঙের শাড়ি পড়েছে সিল্কের, ছোট হাতের ব্লাউজ, গলায় মস্ত মালা—পাথরের, চুল বেঁধেছে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে। বাসনাও মন্দ সাজে নি, তার আজকের সাজে বরাবরের উগ্রতা অবশ্য কম, ওরই মধ্যে যতটা তাতে ওকে আলাদা করে বোঝা যায়। ওর গালের চামড়া রঙে পুরু হতে হতে কর্কশ হয়ে গেছে, এখন আর রঙ ধরার ভাল জমি নেই। বাসনার হাত নির্লোম, চুলের গুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত। তবু, একথা ঠিক, বাসনার চেহারায় প্রলোভনের সামগ্রী আজও কিছু অবশিষ্ট আছে, তার কণ্ঠস্বরও সুন্দর। অতি সুন্দর। বাসনা যেতে যেতে আচমকা কি দেখে গুনগুন করে গাইল ; ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা…’। গেয়েই

থামল, বলল, "দূর···র, আর গান হয় না।"

শশধর আজ একটা ছড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, বাহারী ছড়ি, রাস্তায় ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল, পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে হালকা রঙের বুশ শার্ট। শশধরের যে বয়েস হয়েছে বোঝা যায়, আরও বোঝা যায়—একসময়ে সে সুপুরুষ ছিল। পূর্ণেন্দু পাশাপাশি যাচ্ছে শশধরের; একেবারে সাদামাটা ভাব তার। সন্তু কখনও এখানে, কখনও সেখানে; বকবক করছে একাই, মাঝে মাঝে রাস্তার ধার থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়ছে। পার্বতী প্রায় বাসনার পাশে, সামান্য পিছিয়ে।

দু পাশে কিছু বাড়ি, দু' একটা বেশ বাহারী, কোন-কোনোটা ফাঁকা, কোনো বাগানে ফুল ফুটছে মরসুমের। রাস্তার দু পাশ ধরে গাছ।

বম্বে রোডের কাছে পৌঁছে দেখা গেল, আকাশে লাল মেঘ জমছে, গোধূলিবেলা চলছে। দেখতে দেখতে ঝাপসাটে ভাব গভীর হয়ে সন্ধ্যে নামবে।

মহীপতি বলল, "অন্ধকার হয়ে যাবে ওপরে চড়তে। তাড়াতাড়ি হাঁটুন।"

শশধর বলল, "বাঘ ভাল্লুক নেই তো, অন্ধকার হলেই বা কি?"

"চোখে পথ দেখতে পাবেন না।"

শশধর কি ভেবে হেসে বলল, "মশাই, চোখ থেকেই বা কোন্ আলো আমরা দেখছি!"

কথাটার অর্থ মহীপতি বুঝতে পারল না।

শেষে ফুলডুঙ্রির পায়ের তলায় এসে মহীপতি বলল, "আজ কেউ নেই!"

"নেই কেন?"

"এসেছিল হয়ত, নেমে গেছে।···ওপরেও থাকতে পারে দু একজন, নামছে।"

চারপাশ একেবারে ফাঁকা, ডাক বাংলোটাও নিঝুম হয়ে পড়ে আছে।

ওরা টিলা বেয়ে উঠতে লাগল। গাছপালা, নুড়ি পাথরের

ছড়াছড়ি, লম্বা লম্বা ঘাস, কাঁটা ফুল, শালের চারা উঠেছে এপাশ ওপাশে। পাক খেয়ে খেয়ে পথ, রাস্তাটা .চড়াই যদিও, তবু হাটতে কষ্ট হয় না।

প্রথম পাক শেষ হবার পরই দেখা গেল রবি আর এলা জোরে জোরে হেঁটে আড়ালে চলে গেছে। সন্তু দু হাত ভরে শুধু পাথর কুড়োচ্ছে।

শশধর আর পূর্ণেন্দু পাশাপাশি।

বাসনা পার্বতীকে কি বলছিল। হঠাৎ বাঁকের মুখে গাছ-গাছালির আড়ালে অন্ধকার মতন লাগল।

মহীপতি একা একা যাচ্ছে, দু-চারটে পাথর কুড়িয়ে দিচ্ছে সন্তুকে।

রবি আড়ালে থেকে সাড়া দিয়ে ডাকল, "পাবিদি আমরা এগিয়ে আছি।"

সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে সাড়া দিল। এখানের বাতাসে সেই ডাক চারপাশে ভেসে ভেসে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

দুয়ের পাক শেষ হয়ে যখন তিনের পাক চলছে, বাসনা বলল, "আমি বাবা বসি, এই মোটা শরীরে আর পারি না।"

শশধর বলল, "চারতলা বাড়ি উঠছ, তাতেই পারি না।···নাও, নাও ওঠো। আর দু-এক পাক।

বাসনা বসতে পারল না, একা ঝোপজঙ্গলে বসে থাকাও মুশকিল।

গোল করে পাক খেয়ে খেয়ে টিলাটায় উঠতে হয়; আস্তে আস্তে পশ্চিমের দিকে এসে পড়লে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, লাল মেঘগুলি কালচে হয়ে আসছে, সূর্য ডুবে গেছে। তবু এই ওপরে ঝাপসা একটু আলোর ভাব আছে, নীচে অন্ধকার।

এলা আর রবির গলা পাওয়া যাচ্ছে না। তারা বোধ হয় এতক্ষণে মাথায় পৌঁছে গেছে।

পূর্ণেন্দু বলল, "নামবার সময় কষ্ট হবে দেখছি; একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে।"

শশধর বলল, "গড়গড়িয়ে নেমে যাবে, কষ্ট কিসের হে! এখান থেকে গড়িয়ে পড়লেও মরবে না, হাত-পা জখম হতে পারে।"

বাসনা রাগ করে বলল, "এতই শখ যখন, একটু বেলাবেলি এলেই পারতে।"

কথা বলতে বলতে আরও একটা পাক শেষ হল। রবি আর এলার গলা পাওয়া যাচ্ছে। তারা টিলার মাথায় উঠে বসে আছে। শশধরদের গলা পেয়ে ডাকল, "এদিক দিয়ে উঠে আসুন, ডান দিক নিয়ে।"

একে একে সবাই উঠে এল। ততক্ষণ আর আলো নেই বিন্দুমাত্র, লাল মেঘ কালো হয়ে গেছে, আকাশতলা অন্ধকার, নীচের মাঠঘাটে অন্ধকার ক্রমশই থিতিয়ে গিয়েছে।

হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছিল। হাওয়ায় শীত এসে পড়ছিল। দূরে, অনেকটা দূরে মালার মতন কতকগুলো আলো জ্বলছে, মেঘের তলায় ঝোলানো চীনে লণ্ঠনের মতন দেখাচ্ছিল। গাছপালার গন্ধ ঘন হয়ে আছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। কোথাও জনপ্রাণী নেই। আকাশে তারা ফুটল।

বাসনা বসে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল, রবি দাঁড়িয়ে আছে, এলা বসে। শশধর বসল না, এদিক-ওদিক পায়চারি করল।

পূর্ণেন্দু বলল, "না আর নয়, নেমে পড়াই ভাল। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে।"

মহীপতিও বলল, "চলুন নামি। নামবার সময় আরও অন্ধকার লাগবে।"

শশধর বলল, "চলুন তবে।"

নামার পথে অল্প এসেই সকলেই অন্ধকারে দিশেহারার মতন হল। গাছপাতার আড়াল, টিলার পাথুরে গা—সব যেন ঢেকে ঢুকে গম্ভীর স্তব্ধ এক অন্ধকার সৃষ্টি করছে। চোখ আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না, সমস্তটাই অনুমান করে নিতে হয়।

এমন সময় শশধর সকলকে অবাক করে দিয়ে ম্যাজিক দেখানোর

মতন করে টর্চ জ্বালল। জোরালো টর্চ। হেসে বলল, "নাও, চলো এবার।"

রবি বলল, "শশধরদা টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলেন ?"

"বাইরে বেরিয়ে টর্চ নেব না কি হে! বিকেলের পর পথে বেরুলেই আমি টর্চটা পকেটে পুরে নিই। কেন আগে দেখো নি ?"

কথাটা ঠিকই। টর্চ নেবার অভ্যেস শশধরের বরাবরের। রবিরাও টর্চ নিয়ে বেরোয়, তবে সব সময় নয়। আজ মনেই হয় নি কথাটা।

শশধর টর্চ ফেলে আগে আগে চলল, বাসনা তার পাশে। স্বামীর ভাঙা হাত যেন আগলে আগলে যাচ্ছে।

শশধরের পেছনে পূর্ণেন্দু আর সন্তু। ছেলের হাত ধরে আছে পূর্ণেন্দু শক্ত করে।

পূর্ণেন্দুর পেছনে রবি আর এলা। আলোর ওপর চোখ রেখেছে এলা, একটা হাত দিয়ে রবির হাত চেপে ধরেছে।

সবার পেছনে পার্বতী আর মহীপতি পাশাপাশি।

পাথুরে রুক্ষ পথ দিয়ে লতাপাতা ঝোপ মাড়িয়ে গাছের আড়াল বাঁচিয়ে ওরা নামছিল। মাটি থেকে চোখ তোলার অবসর কারও নেই, আলোর বাইরে তাকাবার সাহসও নেই। কথাবার্তা বড় কেউ বলছিল না। চুপচাপ ওরা নামছে। মাঝে মাঝে দু-একটি কথা এলোমেলো ভাবে শোনা যাচ্ছে।

অনেক নেমে এল ওরা আস্তে আস্তে ; সময় লাগল। কুয়াশা জমে উঠেছে। অন্ধকার নিবিড়। বুনো ফুলের গন্ধ উঠল কোথাও, কোথাও বা পায়ের ঠোক্করে পাথরের নুড়ি গড়িয়ে পড়ল। বম্বে রোড ধরে আলোর ফলা ফেলে একটা গাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটে গেল।

এলা বলল, "বাব্বা এতক্ষণে বাঁচলাম।"

রবি হেসে বলল, "একটা পাগলা শিয়াল ডাকছে নীচে।"

"ধ্যা ..."

"ডাকছে…। শুনতে পাচ্ছি।"

"কই ? আমি তো পাচ্ছি না !"

"ভাল করে শোনো ।"

পূর্ণেন্দু সন্তুকে আদর করে ধমকাচ্ছে । "আঃ, তুই ঠিক করে হাঁট তো । মণ দেড়েক পাথর নিয়ে চলেছে পকেটে করে । বাঁদর !"

সন্তু বলল, "বাড়ি নিয়ে যাব ।"

"কি করবি এত পাথর !"

"রেখে দেব । শান্তাকে একটা দেব ।"

"এত পাথর তোকে নিয়ে যেতে দিচ্ছে···। গাড়িতে ধরবে···"

"লুকিয়ে নিয়ে যাব ।" সন্তু বলল ।

"কোথায় লুকোবি ?" পূর্ণেন্দু মজা করে জিজ্ঞেস করে, "প্যান্টের পকেটে ?"

সন্তু একটু চুপ করে ভাবল, বলল, "মার বিছানার মধ্যে···।"

আরও খানিকটা নেমে ডাক বাংলোর বাতি চোখে পড়ল ।

শশধর ঠাট্টা করে বলল, "কি গো, তোমরা সব নিরাপদে পৌঁছলে তো ?"

সবাই পর পর, শুধু পার্বতী আর মহীপতি কয়েক পা পিছিয়ে গেছে ।

পূর্ণেন্দু এতক্ষণ পরে পিছু ফিরে তাকাল । পার্বতীকে দেখতে পেল না, পায়ের শব্দ পেল, অন্ধকারে ওরা আসছে ।

নীচে নেমে এসেছিল ওরা । বাসনার জলতেষ্টা পেয়ে গেছে, এলারও ।

শশধর সকলকে সঙ্গে করে ডাকবাংলোয় জল খেতে গেল । যদি চায়ের ব্যবস্থা করা হয় চাও খাবে ।

পার্বতী আর মহীপতি কাছাকাছি একটা পাথরে বসল ।

মহীপতি বলল, "সেদিন রাত্রে তোমায় স্বপ্ন দেখলাম ।"

পার্বতী সাড়া দিল না । নামবার সময় সারাটা পথ সে মহীপতির হাত ধরে নেমেছে । অন্ধকারে সে কিছু দেখতে, বুঝতে, চিনতে

পারছিল না। মহীপতি তাকে শেষ সময় আরও কাছে টেনে হাত দিয়ে প্রায় জাপটে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন আর তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে নেই, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

মহীপতি আবার বলল, "তোমার কথা ভাবলে দুঃখ হয়, কিন্তু কি আর করার আছে ?"

পার্বতী পাথরের ওপর নড়েচড়ে বসল সামান্য। বলল, "তোমার শখের দুঃখ দিয়ে আমার কি লাভ !"

"না, লাভের আর কি—," মহীপতি একটু পরে বলল, "কিছুই না।"

পার্বতী নিঃশ্বাস ফেলল শব্দ করে ; পরে হঠাৎ বলল, "তোমার জন্যেই সব।...তুমি আমায় পর পর দুবার মারলে।"

মহীপতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল, পার্বতীর দিকে। শেষে বলল, "আমি তোমার যেটুকু ক্ষতি করেছি তুমি নিজে তার বেশি করেছ।"

"আমি !"

"আর কে ?"

"তুমি, তুমি।...তুমি আমার পা রাখার আর জায়গা রাখলে না।"

মহীপতি রাগ করল না, আহত হল না। শান্তভাবে বলল, "তোমায় একটা কথা বলি। তুমি বার বার পা রাখার চেষ্টা করেও রাখতে পারো নি।"

"কে বলল পারি নি ! পেরেছিলাম। কিন্তু তোমার জন্যে..."

মহীপতি বাধা দিল, বলল, "বেশ, আমার জন্যেই। তাতে কি হল। নিজের পা রাখতে গিয়ে তুমি দুবারই তো কিছু লুকিয়েছ। আমারটা না হয় বাদ দিলাম। কিন্তু শেষেরটা তুমি কেন লুকোলে ?"

কেন লুকিয়েছিল পার্বতী মহীপতি কি তা জানে না ! আশ্রয়ের জন্যে, নিরাপত্তার জন্যে, নির্ভরতার জন্যে। "আমায় বাঁচতে হবে না ? কোথায়, কি নিয়ে আমি বাঁচব ?"

মহীপতি বলল, "তখন ভেবেছিলে না লুকোলে তোমার পা রাখার জায়গা জুটবে না। এখন কি মনে হচ্ছে ?"

"কি ?"

"লুকিয়ে রেখেছিলে বলেই পায়ের তলায় জায়গা থাকছে না।"

পার্বতী কিছু বলতে পারল না। বলার কি বা আছে! এক সময় পার্বতী সত্যিই ভেবেছিল, জীবনের প্রথম ভুলটা সে গোপন না করলে আশ্রয় পাবে না, এখন দেখছে যে আশ্রয়ের লোভে এই গোপনতা সেই আশ্রয়ই এখন ভেঙে যেতে বসেছে। ভেঙে যেতে বসেছে শুধু সেই গোপনতার জন্যেই। আশ্চর্য, একেই বুঝি বলে ভাগ্য! কে জানত, আজ যা লুকিয়ে রেখে ভাবছি আমার লাভ হল, কাল দেখছি লাভ কোথায়, সেই লুকোনো জিনিসটাই আমার লোক-সানের কারণ। পূর্ণেন্দু সরল প্রকৃতির মানুষ, বোকাসোকা, ভদ্র, ভালমানুষ। পার্বতী এখন এটা আঁচ করতে পারে যে, পূর্ণেন্দু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাহ্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে চায় আন্তরিক কোনো বোঝাপড়া, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা। সে যখন জানবে পার্বতী তাকে ঠকিয়ে তার সংসারে এসেছে তখন কি হবে? পূর্ণেন্দু কি খুশী হবে? পার্বতীকে যে মর্যাদা দিয়ে এসেছে এতদিন—সেই মর্যাদা কি আর দেবে? কি হবে সন্তু যদি জানতে পারে কিছু? পূর্ণেন্দুর সঙ্গে গোলমাল বাধলে সে কি কিছুই জানতে পারবে না? এলাই বা কি মনে করবে দিদিকে? এলাও জানে না তার দিদি লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন মহীপতিকে বিয়ে করেছিল। রবিও নিশ্চয় জানতে পারবে। দেখে অবাক হবে, এই তার পাবিদি—যে পাবিদি বাড়িতে কোনো রকম বেচাল দেখলে চটে যায়, যার চোখে নোংরামি সহ্য হয় না, সে নিজেই কত বড় নোংরামি করেছে, করে লুকিয়ে রেখেছিল।

মহীপতি বলল, "আমার কিন্তু একটা কথা মনে হয়।"

পার্বতী তাকাল।

"বাসনা যদি শুনেও থাকে তবু কথাটা সে বলবে না।"

"বলবে না?"

"মনে হয় বলবে না। বাসনা বোধ হয় তোমায় কিছু বলেছে তখন।"

"কখন?"

"কথা বলছিল দেখছিলাম !"

পার্বতী ভাবল একটু, বলল, "না, অন্য কথা বলছিল।" তারপর কি মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, "একবার অবশ্য বলছিল—কলকাতায় ফিরে একদিন আমার বাড়ি যাস। কথা আছে।"

শশধররা ফিরছে। কথা বলতে বলতে কাঁকর মাড়িয়ে আসছে সব। সন্তুর হাতে বোধ হয় টর্চ, যেখানে সেখানে আলো ফেলছে।

পার্বতী বিরক্তি এবং হতাশ গলায় বলল, "এখন দেখছি ওদের সঙ্গে আমায় বনিবনা করে চলতে হবে।···বরাবর আমি ওদের ঘেন্না করেছি, এখনও করি, বাসনাদিকেই আমার বেশি ঘেন্না। তবু আর আমার মুখ নেই। বাঁচবার জন্যে তোয়াজ করতে হবে ওকে। মন যুগিয়ে চলতে হবে। ছি ছি।" বলতে বলতে পার্বতী থামল, ভাবল : "আর এখন থেকে শুধু ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে, কবে পায়ের জমি সরে যায় !"

মহীপতি শুনল, চুপ করে থাকল।

পার্বতী যেন নিজের ভেঙ্গে-যাওয়া অবস্থাটা সামলাবার জন্যে হঠাৎ বলল, "আমার জন্যে একটা অনাথ আশ্রমটাশ্রম খুঁজে রেখো বুঝলে ! বলা তো যায় না—", বলে ম্লান করে হাসল।

মহীপতি বলল, "না, কিছু বলা যায় না। তবু এমন কিছু তোমার না হলেই সুখী হব।"

ওরা কাছে এসে পড়েছিল। মহীপতি উঠে দাঁড়াল, বলল, "ওঠো। ···ওরা আসছে।"

পার্বতী তবু বসে থাকল। চুপ করে। চারপাশে থমথমে অন্ধকার। অজস্র ঝিঁঝিঁ ডাকছে। আকাশ যেন বিশাল এক ছাতা খুলেছে, অসংখ্য তারা দিয়ে সাজানো, এই বন, মাঠ, পাহাড় ও মানুষকে ছাতার তলায় ঢেকে রেখেছে।

সন্তু এসে হাতের টর্চ দোলাতে দোলাতে সোজা পার্বতীর মুখে ফেলল। শশধর বলল, "সন্তু, কারও মুখে টর্চ ফেলতে নেই। দাও আমায় দাও।"

শেষ